আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
এবং হিউম্যানিস্টস্
অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র
Vol. - 7 Issue - 4
দীপাবলি সংখ্যা ২০০৮

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন

সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল

মূল্য : পনেরো টাকা

উপদেষ্টা : প্রবীর ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস :
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪
ফোন : ২৫৫৯-০৪৩৫

হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন
পি ২, ব্লক বি, লেকটাউন কলকাতা-৮৯
ফোন : ২৫২১-৬২৭০

সূচি

সম্পাদকীয়/২

চয়ন : প্রবীর ঘোষ/৩

বিশেষ প্রবন্ধ :
আজাদি : অরুন্ধতী রায়/৭
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নয়ন : অরুণা রায় ও নিখিল দে/১৫
নার্কো টেস্ট কী : সুমিত্রা পদ্মনাভন/১৮

ফিচার :
ন্যানোর হিসাব : হরলাল চক্রবর্তী/২২
ঘরের পাশে সন্ত্রাস : তাপস সিংহ/২৫

আইন :
উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য.../২৭

খবর :
তথ্য জানার লড়াইয়ে জিত/৩১
জমি ফিরে পেলেন/৩৩
বাড়িতে ভূত পোষার শাস্তি/৩৪

চিঠিপত্র :
মার্কসবাদের সাহায্যেই/৩৫
আমি সিঙ্গুরের কৃষক/৩৭

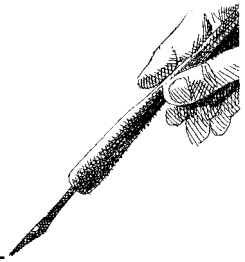

সম্পাদকীয়

ইংল্যান্ডের চার্চ ডারউইনের কাছে ক্ষমা চাইল

বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনের সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধিতা করে এসেছে খ্রিস্টিয় জগৎ এযাবৎ। এতদিনে 'চার্চ অফ ইংল্যান্ড' সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এবারে ডারউইনের বিখ্যাত গ্রন্থ "ওরিজিন অফ স্পিসিজ..." প্রকাশিত হওয়ার ১২৬ বছর বাদে, লিখিতভাবে চার্চ তার এতদিনের অবিশ্বাস, অসম্মানের জন্য ক্ষমা চাইবে। চার্চের ডিরেক্টর ম্যালকম ব্রাউন একটি লিখিত বিবৃতিতে লিখছেন—"আপনার জন্মের ২০০ বছর পর ইংল্যান্ডের চার্চ আপনাকে এতদিন ভুল বোঝার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। প্রাথমিক পর্যায়ে আপনার তত্ত্বকে ভুল ভেবে চার্চ জনসাধারণকেও ভুল বুঝিয়েছে। আমরা চেষ্টা করি 'বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি' করতে। আমাদের এই ভুল স্বীকারই আশাকরি আমাদের নিজেদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা হিসাবে গণ্য হবে।" (সানডে টেলিগ্রাফ, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

অবশ্য কট্টর খ্রিস্টানরা মোটেই এতে খুশি নয়। এখনও আদম-ইভ এবং ঈশ্বর রচিত সৃষ্টিতত্ত্বে স্থির বিশ্বাস এবং ডারউইন-এর প্রতি তীব্র অবিশ্বাসই তাদের মূলধন। যে যত ডারউইন-বিরোধী, সে তত ধার্মিক—এটাই এদের মত।

গ্যালিলিয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানকে চার্চ স্বীকার করেছে ৩০০ বছর পর, আর ডারউইনকে বুঝতে লাগল দেড়শো বছর। ধীরে ধীরে বোধোদয় হচ্ছে। আশা করা যায় ধার্মিকদেরও বুদ্ধির বিকাশ হবে একটু একটু করে—বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী। এরপর নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্বগুলোকে নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে বিরত থাকবে ধর্মীয় নেতারা। মৃত বিজ্ঞানীকে চিঠি লিখে এতদিন কোটি কোটি মানুষকে বিভ্রান্ত করার মতো গুরু অপরাধ স্খালন করা যায় না। তবু এটাও একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ।

রামশিলা আর রামসেতুওয়ালারা এখনও সাবধান হন। নয়তো পরে বোকা বনতে হবে।

প্রশাসন

প্রবীর ঘোষ

'প্রশাসক' শব্দের অর্থ 'যিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা।

রাজার আমলে রাজার শাসন চলত, তাতে সাহায্য করতেন মন্ত্রীরা। এখন দেশে 'গণতন্ত্র' এসেছে। রাজার জায়গায় মন্ত্রীর রাজ চালু হয়েছে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসক মুখ্যমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা। এরা প্রত্যেকেই পাবলিক সার্ভেন্ট। অন্তত সংবিধান তেমনই বলে।

মন্ত্রীরা আসেন-যান। এদের কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। **একজন চাপরাশিকেও স্কুল-ফাইনাল পাশ করতে হয়। একজন মন্ত্রী হতে তারও প্রয়োজন হয় না।** মন্ত্রীদের হয়ে দপ্তর সামলাবার দায়িত্ব দেওয়া হয় পেশাদার প্রশাসকদের। এদের সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, সংক্ষেপে আই এ এস এবং আই আর এস অফিসাররা। এরাই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ পেশাদার পদে আছেন। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, ইনকামট্যাক্স কমিশনার, জেলা জজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে এঁরাই বসেন। বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হয়। এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ওইসব রাজ্যের মাঝারি মাপের প্রশাসকের কাজ করেন। যেমন বিডিও, এসডিও, অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি।

এঁরাই শাসনটা চালান বলে মন্ত্রীরা ঝাড়া হাত-পা। ফোর-ফাইভের বিদ্যে নিয়ে রাবড়ি দেবী বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব সামলালেন রাজ্যের প্রশাসকদের সাহায্যে। রাজ্য চলবে গড়গড়িয়ে—তা সে ভালও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রশাসকদের হুকুম দেন—আমার মেয়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় ফেল করেছে, ওকে ফার্স্ট করে দাও। অমুক স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি দাঁড়ায় না। আমার ভাই ওই স্টেশনে ট্রেনটি ধরতে চায়। ট্রেন ওই স্টেশনে দাঁড় করিয়ে দাও।

না, এসব বানানো গল্প নয়, নির্ভেজাল সত্যি। গদিতে আসীন মন্ত্রী নামের শাসনকর্তা-কর্ত্রী হলেন 'প্রশাসক নম্বার ওয়ান'। তাঁদের দপ্তর যে সব মাইনে করা প্রশাসকরা দেখেন তাঁদের স্ট্যান্ডার্ড বলে এখন কিছুই নেই। তাঁরা এখন মন্ত্রীদের চাকর-বাকরের ভূমিকায় নেমেছেন। মন্ত্রীদের নানা অনৈতিক ও দুর্নীতির সহায়কের

কাজ করে নিজেরাও যথেচ্ছ লুটে-পুটে নিচ্ছে। ব্যতিক্রমীদের সংখ্যা পার্সেনটেজে পড়ে না।

বছর পঞ্চাশ আগে বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেনের মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে এই রাজ্যের প্রশাসকদের মধ্যে সততা, আত্মসম্মানবোধ ছিল। মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনও সচিবকে কোনও অন্যায় অনুরোধ করতেন বা আদেশ দিতেন, তবে তা দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করার মতো সচিবের অভাব ছিল না। কারণ সচিবরা মন্ত্রীদের চিনতেন। বিশ্বাস করতেন, মন্ত্রী কখনই এনিয়ে সচিবদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে না।

গত পঞ্চাশ বছরে গোটা চিত্রটাই পাল্টে গেছে। এই রাজ্যটার দিকে তাকান। এই রাজ্যের শাসনভার আর প্রশাসকদের উপর পুরোপুরি ন্যস্ত নেই। সেই ভার অনেকটাই অধিকার করে নিয়েছে শাসক দলের বড় শরিক সিপিএম। তারা বিশাল ক্যাডার বাহিনী গড়ে তুলেছে। প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি মহল্লায় এই ক্যাডার বাহিনীই প্রশাসনের তৃণমূল স্তর। ওরাই 'প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' চালায়। পার্টির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ওরাই পার্টি অফিসে প্রতিটি পরিবারের, প্রতিটি ব্যক্তির খবর পৌঁছে দেয়। তারা কী খায়, কোন পত্রিকা পড়ে, কোন পার্টিকে ভোট দেয়, তাদের বাড়ি কারা আসে সবই পার্টি অফিসের নজরে আনে। পার্টি অফিস চাইলে উনুন জ্বলবে, জমিতে চাষ করা যাবে, ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পর্ক ঠিক রাখা যাবে। তারা না চাইলে থানায় অভিযোগ করা যাবে না, আদালতে যাওয়া চলবে না, বুথে ভোট দিতে যাওয়া চলবে না। বাড়ি করতে গেলে তোলা দিতে হবে, পাড়ার ক্যাডারদের কাছ থেকে ইট-বালি-পাথর কিনতে হবে। লিডার-ক্যাডাররা কারও বউ-বোনকে একটু-আধটু ধর্ষণ-টর্ষণ করলে পুলিশ-আদালত করা চলবে না। পার্টি অফিসকে জানাতে হবে। তাদের সালিশি মেনে নিতে হবে। বেয়াদপি করলে ধোপা-নাপিত বন্ধ। পরের ধাপে 'দমদম দাওয়াই'। তাতেও ঠিক না হলে প্রয়োগ করা হবে 'কেশপুর দাওয়াই'। জ্বালিয়ে দেওয়া হবে গৃহসমেত গৃহবাসীদের।

প্রশাসনিক বড় বড় দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সি পি এম-এর রাজ্যদপ্তর। কে উপাচার্য হবে, কে হাসপাতালের সুপার, কে চিফ সেক্রেটারি হবে, কে হোম সেক্রেটারি, কে পুলিশ কমিশনার হবে, কে ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ হবে, কে ডি সি ডিডি—এসবই ঠিক করে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের রাজ্যদপ্তর।

এই যে বিশাল এক প্যারালাল প্রশাসনের জাল রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার প্রভাব ভয়ংকর হতে বাধ্য। এইসব প্রশাসকরা সি পি এম-এর কৃপায় চেয়ারে বসতে পেয়ে সিপিএম-কে খুশি রাখতে গিয়ে চাকর-বাকর হয়ে পড়েন।

ক্যাডার থেকে সরকারি দপ্তরের সচিবরা পর্যন্ত দুর্নীতির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দীর্ঘ বছর ধরে সাধারণ মানুষদের শাসন করে চলেছে। এরা কিছুতেই চাইতে

পারে না যে—বামফ্রন্ট ক্ষমতা থেকে সরে যাক; দুর্নীতিমুক্ত হয়ে উঠুক রাজ্যটা এবং রাজ্যের প্রশাসন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রশাসনের অবস্থাও অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের মতো। পার্থক্য শুধু এই—পশ্চিমবঙ্গের মতো ক্যাডার নেটওয়ার্ক আর কোনও রাজ্যে নেই। এই রাজ্যের ক্যাডার বাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ইলেকশন মেশিনারিজ থেকে মন্দির কমিটি সর্বত্র ওরা ছড়িয়ে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্যাডারদের তাই ভয়ও আছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতা হারালে পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রস্ত মানুষরাই যে ওদের পিটিয়ে মারতে পারে, সেটা জানে। ইন্দোনেশিয়ায় ১০ লক্ষ কমিউনিস্টদের হত্যা করার ইতিহাস ওরা ভোলেনি। পেশীশক্তি দিয়ে কেউই চিরকালের জন্য ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেনি, পারবেও না।

৬ এপ্রিল ২০০৮ রবিবার 'অল ইন্ডিয়া রিটায়ার্ড জাজেস অ্যাসোসিয়েশন' নামের এই সংস্থার সম্মেলনে বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা। আলোচনায় এ'কথাও উঠে আসে— সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও সংগঠিত হিংসা এ'কথাই বলে, আমাদের দেশের গণতন্ত্র দুর্বল হচ্ছে।

এর ঠিক চার দিন পরে ১০ এপ্রিল সুপ্রিমকোর্টের ৫ জনের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিল, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ৪৯.৫ শতাংশ জাতপাতের ভিত্তিতে সংরক্ষণের সংশোধনীটি সংবিধানসম্মত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক রায়টির ফলে এক দিকে অনগ্রসর শ্রেণিকে অগ্রসর করার নামে মেধার উৎকর্ষকে অবজ্ঞা ও শিক্ষার গুণগত মানকে নামিয়ে আনার কাজটি সমাধা হল। আর এক দিকে আসন্ন উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মায়াবতীর থাবা থেকে নিম্নবর্গীয় ভোট ছিনিয়ে আনতে কংগ্রেস-কে সাহায্য করবে। কারণ, কংগ্রেস নেতৃত্বেই এই সংরক্ষণ সংশোধনটি আনা হয়েছিল পার্লামেন্টে।

বিভিন্ন মহল থেকে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, সুপ্রিমকোর্টের এই রায় কি কংগ্রেস সরকারকে তুষ্ট করতেই দেওয়া হয়েছে? 'অল ইন্ডিয়া রিটায়ার্ড জাজেস অ্যাসোসিয়েশন' কি এমন কোনও আসন্ন দুর্নীতির ইঙ্গিত করেছিলেন?

প্রশাসনের সর্বস্তরে আজ দুর্নীতির রাজ চলছে। সাহিত্য অকাদেমি থেকে সঙ্গীত আকাদেমি—সর্বত্র সরকারের পেটোয়াদের রমরমা। মধ্যমেধার 'বুদ্ধিজীবীরা' সার কথাটা বুঝে গেছেন যে সরকারের কৃতদাস হলে সরকারি ফ্ল্যাট, পুরস্কার, বিদেশ ভ্রমণ, স্টাডি লিভ, বড় পদ ইত্যাদি জুটবে। আজ সাংস্কৃতিক জগৎ শাসন করছেন মধ্য মেধার বুদ্ধিজীবীরা—কথাটা কটু হলেও সত্যি।

ভোটে জিতে সরকার গড়তে গেলে নানা ফ্যাক্টর কাজ করে। তারই মধ্যে অন্যতম হল ভোটার লিস্ট তৈরি, ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর। এই ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনা করার অধিকারী প্রশাসকরা আমার দলের লোক হলে কেল্লা ফতে। লিস্টে জাল ভোটার ঢুকবে, সরকারের ইস্যু করা রেশনকার্ড দেখিয়ে। এখানেও সরকারকে তুষ্ট করতে চাওয়া রেশন দপ্তরের প্রশাসকের সক্রিয় সহযোগিতা চাই-ই। ভোটের দিন বুথে একই লোক দশ-বিশবার বোতাম টিপলেও ভোট বন্ধ হবে না। এজন্যেই সরকারি কর্মচারী থেকে শিক্ষকদের মধ্যে ইউনিয়নবাজি করতে হয়।

এই দুষ্ট-নষ্ট প্রশাসকদের তৈরি করেছে, পালন ও পুষ্ট করেছে শাসক দল ও তার প্রভুরা। এই বঙ্গ থেকে কেন্দ্র—সর্বত্র কম-বেশি একই ভূমিকায় প্রশাসকরা।

—অলৌলিক নয়, লৌকিক ৪র্থ খণ্ড, নতুন সংস্করণ : প্রবীর ঘোষ

নেপাল : কিছু খবর

সেপ্টেম্বরেই অলিম্পিক শেষ হবার পর ভারত সফর করে গেলেন প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড। অথচ খবরটা তেমন গুরুত্ব দিয়ে দেখানো হল না কোনও টি.ভি. চ্যানেলেই। নিউ দিল্লিতে প্রতিবেশী প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনা সভার ছবি দেখলাম। কিন্তু গুরুত্ব পেল 'মুখোমুখি কারাত ও সোমনাথ চ্যাটার্জি'—এই গুরুত্বহীন বিষয়টা।

রাজতন্ত্র থেকে সাধারণতন্ত্রে পৌঁছতে কত সময় লাগে? নেপালের ইতিহাস বলছে ২৪০ বছর। মাওবাদীরা বলবেন ১০ বছর। রাজতন্ত্রকে বিদায় করতে এক দশক ধরেই তো লড়াই করেছেন এবং জয় এনে দিয়েছেন।

ফিরে তাকাই এপ্রিলের কাগজের ছোট ছোট খবরগুলোর দিকে—

✶ ১০ এপ্রিল : ব্যাপক উৎসাহ, নেপালে ভোট পড়ল ৬০ শতাংশ।

২৪০ বছরের প্রাচীন রাজতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক অবসান, মাওবাদীদের গণতান্ত্রিক মূলস্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এদিনের কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে নির্বাচনে বিক্ষিপ্ত হিংসা সত্ত্বেও ভোট পড়ল ৬০ শতাংশের বেশি।

✶ ১২ এপ্রিল : মাওবাদী এগিয়ে।

নেপালে সাংবিধানিক পরিষদের ভোট গণনার দ্বিতীয় দিনে মাত্র ১৮টি আসনের ফল জানা গিয়েছে। তার মধ্যে ৯টিতে জিতেছে মাওবাদীরা। মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড কাঠমান্ডু কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন। আরও ৬০ আসনে এগিয়ে রয়েছে মাওবাদীরা। দেখেশুনে মনে হচ্ছে মাওবাদীরা শেষ হাসি হাসবে।

✶ ১৩ এপ্রিল : নেপাল : সরকার গঠনের পথে মাওবাদীরা।

অসাধারণ! নেপালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে অভূতপূর্ব, অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য সাফল্য পেল নেপালের মাওবাদীরা। সকলের সব চিন্তা ভাবনাকে ভুল প্রমাণ করে একের পর এক হেভিওয়েট প্রার্থীর পরাজয়ের খবর এসেছে।

"আজাদি"

***অরুন্ধতী রায়**-এর রচনা অবলম্বনে কিছুটা অনুবাদে, কিছুটা আলোচনায়—লিখছেন*

সুমিত্রা পদ্মনাভন

"হাম কেয়া চাহতে?
আ-জা-দি—
"পাকিস্তান সে রিস্তা কেয়া?
লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্"
"আজাদি কা মতলব কেয়া?
লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ্"
"কাশ্মীর কি মান্ডি—
রাওয়ালপিন্ডি"
"খুনী লাকির তোড় দো (লাকির = LOC, সীমানা)
আর পার জোড় দো"
"জিস্ কাশ্মীর কো খুন সে সিঁচা
ওহ্ কাশ্মীর হামারা হ্যয়"
"নাঙ্গা-ভুখা হিন্দুস্তান,
জান সে পেয়ারা পাকিস্তান"

এই স্লোগানগুলো কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামীদের—কাশ্মীরের আমজনতার মিলিত চিৎকার। আশ্চর্য, ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে এত স্পর্ধা? অরুন্ধতী রায় লিখছেন "গত ষাট দিনের ওপর হয়ে গেল—জুন মাসের শেষ থেকে, কাশ্মীরের মানুষ স্বাধীন। খুব গভীরভাবেই স্বাধীন বলতে যা বোঝায়, তাই। ওরা ভয়কে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে, পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবদ্ধ মিলিটারি অধ্যুষিত এলাকায় পাঁচ লক্ষ ভারী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দীর্ঘদিন বসবাস করা, এভাবেই বেঁচে থাকার যে আতঙ্ক তাকে ওরা এখন অগ্রাহ্য করছে।

১৮ বছর ধরে কড়া মিলিটারি পাহারায় কাশ্মীর অঞ্চলকে দখল করে রাখার পর এখন ভারত সরকার দুঃস্বপ্ন সত্যি হতে দেখছে। এতদিন সরকার বলে এসেছে যে আতঙ্কবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সমূলে দমন করা হয়েছে। আর এখন যে বিশাল অহিংস জনজাগরণ, জনবিক্ষোভ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাকে কীভাবে

দমন করা যাবে তা সরকারের জানা নেই। এই জনরোষের মূলে আছে দীর্ঘ বছরের দমন-পীড়নের স্মৃতি, যাতে কুড়ি-তিরিশ হাজারের উপর মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ 'নিঁখোজ' হয়েছে, শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে নাগরিক অত্যাচারিত, আহত, ধর্ষিত, অপমানিত হয়েছে। এই রোষ একবার প্রতিবাদের ভাষা পেলে তাকে আর সহজে পোষ মানানো যায় না। তখন আর তাকে মাথায় হাত বুলিয়ে, বোতলবন্দি করে ফেরৎ পাঠানো যায় না।

এক বছর ধরে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা, গভীরভাবে সন্ত্রাসবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র, যতরকম উপায়ে পেরেছে, কাশ্মীরের জনগণের প্রতিবাদের উচ্চারণকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। খবর চাপা দিয়ে, ভুল খবর দিয়ে, সত্য গোপন করে, অপব্যাখ্যা করে, ভয় দেখিয়ে, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, ইনফর্মার নাম দিয়ে অত্যাচার ও বন্দি করে, ব্ল্যাকমেল করে, ভোটের নামে নির্লজ্জ রিগিং করে জনগণের ইচ্ছাকে চাপা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা সন্ত্রাসবাদী অত্যাচারী রাষ্ট্রের যা হয়, তাই হতে চলেছে—নিজের পাপের জালে জড়িয়ে, নিজেরই অপপ্রচারের ফাঁদে ধরা পড়ে মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে। এতদিন এই 'মহান' রাষ্ট্র বিশ্বাস করেছিল দমনের আরেক নাম জয়, বন্দুকের নলে 'স্বাভাবিক' করে রাখা জনজীবন সত্যিই স্বাভাবিক, আর নাগরিকদের বিমর্ষ স্তব্ধতা বশ্যতা স্বীকারেরই লক্ষণ।

এতদিন বলিউডি ছবিগুলো কাশ্মীর-মুসলিম সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ ভারতীয়দের মগজ ধোলাই করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে কাশ্মীরের যত হয়রানি সবই দুষ্ট, নিষ্ঠুর সন্ত্রাসবাদীদের অপকর্মের ফল। সরকারও কাশ্মীরের নাগরিকদের হয়ে বলে বেড়াচ্ছিল যে ওরা এখন শান্তি চায়—অনেক হিংসা হয়েছে, ওরা এখন ক্লান্ত। কিন্তু কেমন সেই শান্তি?

কেউ একটু ভালবেসে প্রশ্ন করুক, বা শুধু একটু কান খুলে শুনুক, তাহলেই জানতে পারবে যে কাশ্মীরিরা তাদের ভয়ঙ্কর দুর্দিনেও শুধু শান্তি চায়নি, স্বাধীনতাও চেয়েছে।

আজ হঠাৎ করে কাশ্মীরে হিমালয়ের কোলে ১০০ একর বনভূমি অমরনাথ মন্দির বোর্ডের নামে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল। আর তার পরিণতি হল এক ড্রাম পেট্রোলে একটা ছোট্ট জ্বলন্ত দেশলাই ছুঁড়ে দেওয়ার মতো। ১৯৮৯ পর্যন্ত অমরনাথে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা ছিল মরশুমের দু-সপ্তাহে হাজার কুড়ির মতো। কিন্তু ১৯৯০ এর পর থেকে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে হিন্দুত্বের ঢালাও প্রচার ও প্রসারে ক্রমশ তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ২০০৮-এ এই সংখ্যাটা হয়ে দাঁড়াল পাঁচ লক্ষ। বড় বড় দলে হিন্দুদের স্রোত বয়ে চলল অমরনাথ গুহা অভিমুখে। কোনও কোনও দলকে স্পনসর করছিল

কোনও বড় শিল্পগোষ্ঠী। উপত্যকার মানুষদের কাছে এই হঠাৎ বেড়ে ওঠা জনস্রোত একটা রাজনৈতিক বার্তা বহন করে নিয়ে এল। তারপর এই জমি দখল কাশ্মীরিদের মনে ভয় ধরিয়ে দিল; ওরা মনে করল এইভাবেই ইজরায়েলি কায়দায় একটু একটু করে দখল চলতে থাকবে হিন্দুত্ববাদী ভারত রাষ্ট্রের এবং শেষপর্যন্ত উপত্যকার চেহারাই যাবে পাল্টে। শুরু হল তীব্র প্রতিবাদ—শহর থেকে গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ল। তরুণ প্রজন্ম পাথর ছুঁড়তে ছুঁড়তে মুখোমুখি হল পুলিশের। গুলিতে প্রাণ দিল অনেকে। ৯০ এর স্মৃতি মনে এল। কয়েক সপ্তাহ হরতাল, পুলিশের গুলি চলল।

হিন্দু প্রচারযন্ত্র যখন কাশ্মীরিদের হাজারো অপকর্মের প্রচারে লিপ্ত, সেই সময়ে পাঁচ লক্ষ তীর্থযাত্রীরা শুধু অক্ষতদেহে ফিরেই এল না, তাদের মুখে সবাই শুনল স্থানীয় কাশ্মীরিদের আদর যত্ন ও আতিথেয়তার গল্প। এদিকে হঠাৎ কাশ্মীরি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের ও প্রতিবাদের তীব্রতায় চমকে গিয়ে সরকার জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গুটিয়ে নিল। কিন্তু ততদিনে প্রতিবাদের ঢেউ এতটাই উত্তাল যে জমি-টমির ব্যাপারটা (সৈয়দ আলি শাহ গিলানির ভাষায়) এমন একটা কিছু ব্যাপার নয়—একটা 'নন-ইস্যু' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জমি ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে এবার তীব্র প্রতিবাদের ঢেউ উঠল জম্মুতে। সেখানেও ইস্যুটা বাড়তে বাড়তে অনেক বড় আকার নিল। হিন্দুরা দীর্ঘ অবহেলা ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদের জেরে জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়ে অবরোধ হল। বন্ধ হল ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যেকার একমাত্র যোগাযোগের পথ। সেনা নামানো হল রাস্তা চালু করার জন্য, ট্রাক চলাচল অব্যাহত রাখতে। কিন্তু কাশ্মীরি ট্রাক চালকদের উপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ল সুদূর পাঞ্জাব অবধি। আর তাতে ভয় পেয়ে চালকরা হাইওয়েতে ট্রাক চালাতে অস্বীকার করল। যান চলাচলের অভাবে খাবার-দাবার, ফল পচে নষ্ট হল। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। সত্যিই অবরোধ, না কি সন্ত্রাসের ভয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে অবরোধের 'মতো' কিছু, তা মিডিয়ার প্রচারে স্পষ্ট ছিল না।

আসলে 'অবরোধ'টা ছিল মানসিক, আত্মিক। কাশ্মীরিরা বুঝে গেল যে তারা ভারতের কেউ না। আম কাশ্মীরিদের কাছে সংকেত গেল যে গোলমাল করলে তাদের বিচ্ছিন্ন হতে হবে। তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্য সরবরাহ, ব্যবসা—সব বন্ধ করে তাদের ভুখা মরতে হবে। ভারত ও কাশ্মীরের মধ্যে সূক্ষ্ম যেটুকু যোগাযোগ ছিল—তাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেল ভাবলে ভুল হবে। আমরা কি আগেও দেখিনি, যে কাশ্মীরিরা সাধারণ ন্যায্য দাবিতে বিদ্যুৎ বা জলের জন্য ক্ষোভ জানালে তা-ও বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়। তাদের ভুখা মারার ভয়

দেখানো তো রাজনৈতিক আত্মঘাতের সামিল! তাই এবারে যে কণ্ঠ এতদিন ভারত সরকার চাপা দিয়ে রেখেছিল, কাশ্মীর জুড়ে সেই কণ্ঠস্বর তীব্র গগনভেদী গর্জনে পরিণত হল। শত সহস্র নিরস্ত্র মানুষ পথে নেমে এসেছে, তাদের গ্রাম, শহর, পাড়া দখল করতে। শুধু তাদের বিশাল সংখ্যা-ই তারা সেনাবাহিনীকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক উগ্র, নগ্ন ভয়হীনতা।

এখানকার তরুণ প্রজন্ম বড় হয়েছে সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্পের খেলার মাঠ, চেকপোস্ট, বাঙ্কারে। তাদের কানে বাজছে বন্দি অত্যাচারিতের তীব্র চিৎকার। তারা আর ভয় পায় না। তারা এক অভূতপূর্ব নতুন শক্তি অর্জন করেছে—সে শক্তি সম্মিলিত গণপ্রতিবাদের শক্তি। আর সবার উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজেদের দাবি নিজেদের ভাষায় ব্যক্ত করার শক্তি। এখন আর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সেনাবাহিনীকে তারা গ্রাহ্য করে না, কারণ মৃত্যুর ভয়ই আর তাদের ধরে রাখতে পারছে না। ভারতের মানুষের কাছে এই ভয়হীনতা নতুন কিছু তো নয়। এই ভাবেই তো তারা একসময় স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

কাশ্মীরে গণপ্রতিরোধ আগেও হয়েছে, কিন্তু এত লাগাতার ভাবে এত ব্যাপ্তি নিয়ে কখনও হয়নি। এখন আর গালগল্প দিয়ে পুরোনো কায়দায় বলা যাবে না যে সব আই.এস.আই. এর কাজ, বা কিছু সন্ত্রাসবাদী এই নিরীহ কাশ্মীরিদের জোরজবরদস্তি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে সামিল করছে। সেই ত্রিশ-এর দশক থেকেই 'কাশ্মীরি ভাবাবেগ' নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা চলে আসছে। কে বা কারা এই কাশ্মীরি সেন্টিমেন্টের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে কে জানে—শেখ আবদুল্লা? মুসলিম কনফারেন্স? আজ কারা করছে? প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো? হুরিয়ৎ? সন্ত্রাসবাদীরা? এবার লাগাম হাতে নিয়েছে জনগণ স্বয়ং। কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো—জাতীয় কংগ্রেস, পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি—মহান ভারত রাষ্ট্র এবং ভারতীয় মিডিয়ার দ্বারা বারবার অভিনন্দিত হয়েছে, নয়া দিল্লির টি.ভি. স্টুডিয়োতে নিষ্ঠার সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের রাস্তায় নামার সাহস দেখিয়েছে কি? যেসব সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা একসময়—খুব খারাপ সময়ে—স্বাধীনতাকামী জনগণের নেতৃত্ব দিয়েছে, তারাও এখন পেছনের সারিতে। তারা পেছনে থেকেই জনগণের নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছে। আসলে জনগণ সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ হলে পেছন থেকেও নেতৃত্ব দেওয়া যায়।

দিনের পর দিন, দলে দলে, হাজারে হাজারে মানুষ ভিড় করেছে তাদের সবচেয়ে সংবেদনশীল স্মৃতিমেদুর স্থানগুলোতে। তারা ভেঙে ফেলেছে সৈন্যদের বাঙ্কার, কাঁটাতারের বেড়া, সোজা তাকিয়েছে বন্দুকের নলের মুখে। তাদের স্লোগান—না কোন ভারতীয়েরই শুনতে ভাল লাগবে না—তাদের স্লোগান—"হাম কেয়া চাহ্‌তে? আজাদি!" আর তার সঙ্গে একই দমে "জীভে, জীভে, পাকিস্তান" (পাকিস্তান যুগ যুগ জিও)। এই চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে পাহাড়ে, পাহাড়ে

মেঘগর্জনের মতো। এটাই জনগণের প্লেবিসাইট বা গণভোট যা কখনই সঠিকভাবে নেওয়া হয়নি, সবসময়ই পেছোনো হয়েছে।

এবছর ১৫ আগস্ট তারিখে পুরো শ্রীনগর শহর সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। যে বক্সী স্টেডিয়ামে ১৯৯২ সালে বিজেপি নেতা মুরলী মনোহর যোশী বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্সের জওয়ানদের দিয়ে পতাকা উত্তোলনের একটা রীতি চালু করেন, সেখানে রাজ্যপাল এন.এন. ভোরা পতাকা তুললেন একটা সম্পূর্ণ খালি, জনমানবহীন পরিবেশে। তার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শহরের প্রাণকেন্দ্র লাল চৌকে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়ে পাকিস্তানের পতাকা তোলেন। তারা পরস্পরকে অভিনন্দিত করলেন 'হ্যাপি স্লেভারি ডে' (শুভ দাসত্ব দিবস) এবং 'হ্যাপি বিলেটেড্ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে' বলে (দেরি করে হলেও শুভ স্বাধীনতা দিবস—পাকিস্তানের ১৪ আগস্টকে মনে রেখে)।

তারপর ১৬ আগস্ট ৩০০,০০০ মানুষের মিছিল চলল পাম্পোরের সেই গ্রামে যেখানে পাঁচদিন আগে হুরিয়ৎ নেতা শেখ আব্দুল আজিজের মৃত্যু হয়েছে সৈন্যবাহিনীর গুলিতে। কোনও সংঘর্ষ নয়, ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে আজিজ-কে। আজিজ লাইন অফ কন্ট্রোল অভিমুখে একটা বিশাল মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাদের দাবি ছিল—যেহেতু জম্মু রোড অবরুদ্ধ, শ্রীনগর-মুজফ্‌ফরাবাদ হাইওয়ে খুলে দেওয়া হোক; সেটাই যুক্তিসঙ্গত। কাশ্মীর ভাগ হওয়ার আগে সে পথেই মানুষ ও পণ্য যাতায়াত করত।

এর পর ১৮ আগস্ট সেইরকমই বিশাল একটি জনসমাবেশ হল শ্রীনগরের টি.আর.সি. ময়দানে। তার খুব কাছে UNMOGIP (ইউনাইটেড নেশনস্ মিলিটারি অবজারভারস্ গ্রুপ ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান) অফিস। জনগণ একটা স্মারকলিপি পেশ করে সেখানে। দাবি তিনটি। ভারতীয় শাসনের অবসান, রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েন এবং গত দু-দশকের সামরিক অপরাধের তদন্ত—যা সংঘটিত হয়েছে ভারতীয় পুলিশ ও সৈন্যদলের লাগামহীন স্বাধীনতার স্পর্ধায়।

এই র‍্যালির আগের দিন মহান ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র কিন্তু একটা কঠিন কাজে ব্যস্ত ছিল। এক অগ্রজ সাংবাদিক জানালেন যে স্বরাষ্ট্র সচিব দিল্লিতে ঠিক সন্ধের আগের এক জরুরি উচ্চস্তরের মিটিং ডাকেন। এই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন ডিফেন্স সেক্রেটারী এবং ইনটেলিজেন্স বিভাগের পদস্থ অফিসাররা। মিটিং এর উদ্দেশ্য কী? না, সমস্ত টি.ভি. সংবাদ চ্যানেলগুলোকে জানানো যে সরকারের কাছে খবর আছে আই.এস.আই. এর একটা ছোট্ট দল কাশ্মীরের এই গণঅভ্যুত্থানের পিছনে কাজ করছে। টি.ভি. চ্যানেলগুলো কাশ্মীরের খবর কভার করার সময় যেন এই কথাটি মনে রাখে? মজার কথা হল টি.ভি. চ্যানেলগুলো যদি সত্যিই এই কথা প্রচার করতে যায়, তাহলে নিজেদেরই বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে, এতই

হাস্যকর শোনাবে কথাগুলো। হায় মহান ভারতের রাষ্ট্রশক্তি! কী করুণ তার অবস্থা!

১৭ আগস্টের রাত থেকেই পুলিশ ঘিরে ফেলল শ্রীনগর শহর। রাস্তা ব্যারিকেড করে হাজার হাজার সশস্ত্র পুলিশ শহরে ঢোকার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮ আগস্ট সকাল হতেই দলে দলে মানুষ, ট্রাকে, জিপে, বাসে, টেম্পোয় করে, পায়ে হেঁটে দখল নিল শ্রীনগরের। পুলিশের হাতে তখন দু'টো পথ—এক, সরে দাঁড়ানো, দুই, গণহত্যা শুরু করা। পুলিশ সরে দাঁড়াল। একটা গুলিও বেরোলো না।

লোকের মুখে হাসি, হাতে পতাকা। প্রত্যেকের হাতে নিজস্ব সংগঠনের পতাকা। হাউস বোটের মালিক থেকে ব্যবসায়ী, ছাত্র, আইনজীবী, ডাক্তার—সক্কলের। একজনের ব্যানারে লেখা 'আমরা সবাই বন্দি, আমাদের মুক্তি দাও'। একজন লিখেছে 'স্বাধীনতা হরণ করে গণতন্ত্র হয় না'। সত্যিই এই মহান ভারতের গণতন্ত্র অদ্ভুত বিকৃত এক যুক্তির উপরে দাঁড়িয়ে আছে—এখানে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখতে হয় সাম্প্রদায়িক হানাহানিকে কাজে লাগিয়ে। এবং এখানে এই পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্র' পৃথিবীর বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী অধিকৃত অঞ্চলকে দখলে রেখেও নিজেকে 'গণতন্ত্র' বলে জাহির করে।

প্রতিটি ল্যাম্প-পোস্টে, বাড়ির ছাদে, বাস স্টপে, চিনার গাছের আগায় সবুজ নিশান। আকাশবাণী ভবনের বাইরেও বিরাট পতাকা উড়ছে। রাস্তার দিক নির্দেশগুলো রং করে তার ওপর লেখা হয়েছে রাওয়ালপিন্ডি বা পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রতি এই ভালবাসা বা ভক্তির দু'টো কারণ হতে পারে। একটা স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতায়, কারণ ভারত যেখানে এই কাশ্মীরিদের সন্ত্রাসবাদী নাম দিয়েছে, পাকিস্তান তাদের বলছে স্বাধীনতা সংগ্রামী। দ্বিতীয় কারণ শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা। দুষ্টুমি করে ভারতকে রাগাতেই পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। যে পাকিস্তান একসময় পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)-এ অত্যাচার চালিয়েছে, যে পাকিস্তান এখনও নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জর্জরিত, তার প্রতি কেন এই ভালবাসা? তবে তার আগে দেখা উচিত এই বৃহৎ গণতন্ত্র ভারত কী এমন করল যাতে উপত্যকার মানুষের মনে এতখানি ঘৃণা জমা হল?"

স্লোগানগুলোর কথা শুরুতেই লেখা হয়েছে। একজন অমুসলিমের পক্ষে এইসব স্লোগানের নিহিত অর্থ অনুধাবন করা মুশকিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে আল্লাকে এক করে দেওয়া একটা অদ্ভুত চিন্তা। একটি অল্পবয়সী মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হল—মেয়ে হিসাবে স্বাধীন ইসলামিক কাশ্মীর কি তাঁর স্বাধীনতাকে খর্ব করবে না? (মুসলিম দেশে মেয়েরা তো অনেকটাই পরাধীন)। মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল—"এখন আমাদের কী স্বাধীনতা আছে? ভারতীয়

সেনাবাহিনীর দ্বারা ধর্ষিত হওয়ার স্বাধীনতা?" প্রশ্নকর্ত্রী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ছিঃ, এর নাম গণতন্ত্র?

অরুন্ধতী রায়ের স্বচক্ষে দেখা গণঅভ্যুত্থানের বর্ণনা পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিল। আর কষ্ট হল এর পেছনে জোরালো ভাবে ধর্মীয় আবেগের উপস্থিতি দেখে। এতদিন জানতাম কাশ্মীরিরা স্বাধীনতা চায়, এখন বিভিন্ন দল ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো এক হয়ে যাওয়াতে তাদের ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগাতে হচ্ছে আরও বেশি করে। পাকিস্তান-প্রীতি আরও বেশি করে মাথা চাড়া দিয়েছে। এটা খুব দুঃখজনক। কিন্তু কোণঠাসা বেড়াল মরার আগে মেরেই মরে। ওদের অবস্থা এখন অনেকটা তাই।

ভারত রাষ্ট্রের মিথ্যাচারিতা ও অপপ্রচার বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরিদের দমিয়ে দেওয়ার বদলে আরও ধর্ম-সচেতন, আরও অধিকার সচেতন করে তুলেছে। কেন এই ঘৃণা? এত অবিচার? যে অংশকে 'ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ' বলছি, সেখানকার মানুষকেই তাহলে ভারতীয় বলে মানছি না। শত্রুর মতো টিপে হত্যা করে চলেছি বছরের পর বছর? এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যখন স্বাধীনতা দিলে তারা স্বাধীনভাবে সুখে থাকতে পারত, তখন তার বদলে দমন পীড়ন চালু করে ঘৃণা ও শত্রুতা এতটাই বাড়িয়ে তুলেছি যে এখন ওরা পাকিস্তানের সঙ্গে এক হতেও রাজী। **এই অবস্থা তো ভারত রাষ্ট্রেরই তৈরি।** রাস্তা বন্ধ করে, ব্যবসা বন্ধ করে, আরও আরও সৈন্যদল পাঠিয়ে ভারত সরকার কী প্রমাণ করতে চাইছে? কাশ্মীর আমাদের? আমরা কাশ্মীরকে ভালবাসি? আর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থীরাই বা চুপ কেন? তাদের কি কোনও মতামতই নেই? ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ আর গোষ্ঠী রাজনীতির উপরে কিছুই তাদের মাথায় ঢোকে না?

'মহান' ভারত আসলে কী চায়? সবুজ নিশানের বদলে গেরুয়া আর 'পাকিস্তান যুগ যুগ জিও'র বদলে 'হিন্দুস্তান যুগ যুগ জিও'? কোন অন্ধকার যুগে পড়ে আছে আমাদের নেতারা? যারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয় তারা কি ব্রাত্য? যারা ধর্ম মানে না তারাও কি মানুষ নয়? দেশভাগের পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় দশ লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সেই দুঃস্বপ্নও কি আমাদের শেখায়নি কিছু? ধর্মের ঊর্দ্ধে উঠে মানবিক মূল্যবোধ, সততা, ভালবাসা দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া কেন এখনও, এ একুশ শতকেও এতই অসম্ভব!

কাশ্মীরের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিকদের নিজেদেরই ঠিক করতে হবে তারা কী চায়—মুসলিম মৌলবাদী দেশ হবে, না কি স্বাধীন সেক্যুলার রাষ্ট্র হবে। আর ভারতকে স্বীকার করতে হবে সত্যি কথাটা। **দীর্ঘ সামরিকীকরণ কোনও জনগোষ্ঠীকে দখলে রাখার পথ হতে পারে না। শ্রদ্ধা, আনুগত্য কখনও গায়ের জোরে আদায় করা যায় না।**

অরুন্ধতী লিখেছিলেন—আরও পাঁচ লক্ষ সেনা নামিয়ে, আরও কিছু বাছা বাছা নেতাকে হত্যা করে আরও ক'দিন ধ্বংসলীলা চালানো যেতে পারে। তাই কি

হচ্ছে? আমরা যারা ইতিহাস, ভূগোল পড়েছি, আমরা কি চুপ করে থাকব? এই বিপুল অর্থব্যয় করে একটা অঞ্চলকে (যে অঞ্চলটা ভারত যখন ব্রিটিশ শাসনাধীন, তখনও স্বাধীন ছিল) দখল করে না রেখে সেই অর্থে মূল ভূখণ্ডের ৪২% দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ (হিন্দু, মুসলিম নয়, মানুষ)-কে স্কুল, খাদ্য, হাসপাতাল দেওয়ার কথা বলব না?

সেপ্টেম্বরের প্রথমে জানলাম সত্যিই আবার আরও কয়েক ব্যাটালিয়ান সেনা নামানো হয়েছে। সমস্ত রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে সীল করে দেওয়া হয়েছে। বন্দি পশুর মতো অনাহারে, অত্যাচারে মেরে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে এদেশেরই কিছু মানুষকে। (বি.বি.সি. ও সি.এন.এন. এর খবর)

তারপরই ঘটল সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। দিল্লির জনবহুল তিনটি অঞ্চলে বোমা বিস্ফোরণে প্রায় ত্রিশজন নিরীহ, নির্বিরোধী দেশবাসী মারা গেল।

আমরা কী চাইব? বাজার এলাকায় নিরীহ মানুষের মৃত্যুর জন্য দুঃখপ্রকাশ, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা, সন্দেহজনক কিছু মানুষের গ্রেপ্তার। ব্যস? তারপর আবার চুপচাপ। কেন? রাষ্ট্রীয় নেতারা যদি জনসাধারণকে সুরক্ষা না দিতে পারেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধান না করতে পারেন, তাহলে তারা পদত্যাগ করুন। অবশ্যই নিরীহ মানুষকে হত্যা করা ঘৃণ্য কাজ। অপরাধী ধরা পড়লে চরম শাস্তিই কাম্য। কিন্তু আমরা কি তার গভীরে যাব না? কেন পরপর এভাবে ধ্বংসলীলা চলবে? আজ আমেদাবাদ, কাল ব্যাঙ্গালোর, পরশু দিল্লি। এমনি এমনি কেউ এত ঝুঁকি নিয়ে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়? ১৮ বছর ধরে চলতে থাকা নারকীয় বর্বরতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, যখন সারা পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ বুঝছে ভারত সরকারের কাশ্মীর ইস্যুতে চরম অপদার্থতা, যখন UNO পর্যন্ত ভারতকে স্থায়ী সদস্যপদ দিতে নারাজ শুধু কাশ্মীরকে অন্যায়ভাবে দখল করে রাখার কারণে, তখন আসুন আমরা দাবি করি— অবিলম্বে কাশ্মীর থেকে সমস্ত সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে তাদেরকে দেশের ভেতর নিরাপত্তা দেখার কাজ দেওয়া হোক। যে নেতৃত্ব দেশের সাধারণ মানুষের সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে না; নিজেরা বুলেট প্রুফ গাড়িতে যাতায়াত করেন, অথচ বড় বড় শহরের জনবসতি বিপদমুক্ত রাখতে অক্ষম। কোন মুখে এঁরা কাশ্মীর নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করতে সাহস পান!

তাঁরা 'তীব্র নিন্দা' করতে পারেন, 'দুঃখপ্রকাশ' করতে পারেন। কিন্তু গ্যারান্টি দিতে পারেন নিরাপত্তার? হলফ করে বলতে পারেন—না, আর এরকম হবে না—মুম্বই বা চেন্নাই বা কলকাতায়—আর কোথাও নাশকতামূলক কাজ হবে না। যদি তা না পারেন, ছেড়ে দিন কাশ্মীরকে। যদি স্থায়ী সমাধান না করেন, চোর পুলিশ খেলা, আর দোষী সন্দেহে যাকে তাকে গ্রেপ্তারের এই নাটক কতদিন চলবে? দেশ জুড়ে কাশ্মীর ইস্যুর স্থায়ী সমাধানের দাবি উঠুক। একদা শান্তিপ্রিয়, অতিথিবৎসল এই কাশ্মীরিদের দাবিকে মর্যাদা দিয়েই আসবে সমাধান।

(সৌজন্য : আউটলুক পত্রিকা, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ছাড়া উন্নয়ন অর্থহীন

অরুণা রায় ও নিখিল দে

বেশিরভাগ মানুষ আজকাল এই ধরণের লেখা পড়েন না। আমরা জানি কাগজটি হাতে পেলেও সবাই লেখাটা পড়ার উৎসাহ পাবেন না, কারণ সবাই এখন অর্থনৈতিক উন্নতির থেকে বাকী সমাজটাকে আলাদা করে দেখেন। আমাদের অর্থনীতিও সঙ্কীর্ণ হতে হতে শুধুমাত্র অর্থ ও মুনাফাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। স্টক মার্কেটে কী হচ্ছে, তথাকথিত লগ্নিগুলোর কী অবস্থা হল, এইসব জানার জন্যই মানুষের বিপুল উৎসাহ। অর্থাৎ আমাদের দেশের স্বচ্ছল অংশের কতটা কৃতিত্ব তাতেই আমাদের উন্নতি সীমাবদ্ধ।

আমাদের দৃষ্টি এতটাই বিকৃত হয়ে গেছে, যে সকালে উঠে শেয়ার বাজারের হালহকিকৎ জানতে আগ্রহী থাকি, কিন্তু মানব-উন্নয়ন সূচকের হিসাবে আমাদের দেশের অবস্থান জানতে কোনও উৎসাহই বোধ করি না। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির ৮% হারের পাশাপশি যে ভয়াবহ সমস্ত পরিসংখ্যান রয়েছে সার্বিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সাক্ষরতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি বিষয়ে, সেটা আমরা খেয়ালই করি না। সেটাই তো জাতি হিসাবে আমাদের ভগ্ন স্বাস্থ্যের আসল কারণ। মাওবাদের উত্থান, বাংলায় টাটা-বিরোধিতা, ওড়িশায় 'বালকো' বিরোধিতা অথবা সারাদেশে 'এস.ই.জেড' বিরোধিতাকে আমরা উন্নয়নের পথে বাধা হিসাবে দেখি। পরিবেশ দূষণের ব্যাপারটা পরিবেশ সচেতন পাগলদের ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার বলে মনে করি। আমাদের অর্থনীতি বোধ এর গোড়ায়ই খুব গুরুতর গলদ রয়েছে।

'অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টি' বলতে যা বোঝায় তার সংজ্ঞাতেই গোলমাল হচ্ছে আমাদের। গত শতকে বিষয় হিসাবে অর্থনীতির স্থান সবচেয়ে উঁচুতে ছিল। অর্থনীতি শুধু একটা বিশ্লেষণভিত্তিক সমাজ বিজ্ঞানই ছিল না, তার নিজের সংজ্ঞা অনুযায়ী অঙ্কের হিসাবে নিখুঁতভাবে ভবিষ্যৎ নির্ধারণও করতে পারে বলে পণ্ডিতরা দাবি করত। আর এই অঙ্কের হিসাব করতে গিয়ে অনেক সময়েই দেখা গেছে যে সর্বাঙ্গীণ সমাজকল্যাণের চেয়ে অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে লাভের অঙ্ক।

আজ যখন শেয়ার বাজারের অভূতপূর্ব ধস, দেশের ধনীদের একেবারে তীব্র অবসাদে ডুবিয়ে দিয়েছে, আসুন দেখি আমাদের তাবড় তাবড় অর্থনীতিবিদরা

অর্থনীতির যে মডেল আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এযাবৎ, তা কতটা ঠুনকো আর ক্ষণস্থায়ী। আমাদের অনেক কথাকথিত অর্থনীতির গবেষক-বিশ্লেষক আছেন, যারা সেনসেক্স-শেয়ার বাজারের ফাটকাবাজী বিষয়ে মূল্যবান মন্তব্য করেন—যেটা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার আদৌ কোনও মাপকাঠিই নয়। দেশে এখন একটা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান হয়েছে যারা ফাটকাবাজ বা জুয়াড়ি ছাড়া কিছুই নয়। তারা রোজকার শেয়ার বাজারের উপর পুরোপুরিই নির্ভরশীল। তাদের আরও উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার স্বপ্ন শুধু এই জুয়াখেলার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। আর আমাদের এই বিশাল দেশের অর্থনৈতিক শক্তি সূচিত হচ্ছে এই একটা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু শ্রেণীর ফাঁপানো সম্পদের উপর ভিত্তি করে। আবার এর উপরে আছে আমাদের মিডিয়ার সাম্রাজ্য—তারাও সমাজ ও অর্থনীতিকে আলাদা করতে সাহায্য করছে। কারণ তাদের টি.আর.পি. পুরোপুরি নির্ভর করে আছে দেশের বিত্তশালী, ক্রয়ক্ষমতাশালী শ্রেণীর উপর। এখন আমাদের বোঝার সময় এসেছে যে দেশের সামগ্রিক ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য, সামাজিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য—এই তিনটে-কে একসঙ্গে সম্পর্কিত করে না-দেখলে চলবে না। আর বিষয় হিসাবে অর্থনীতিকেও দেশের সব মানুষের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সব মানুষের সুযোগ ও ক্রয় ক্ষমতাকে যুক্ত কতে হবে।

একটা মৌলিক সত্যকে পরিষ্কার করে নেওয়ার সময় হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এই ক্রমবর্ধমান ফারাক কিন্তু বেশিদিন চলতে পারে না। বেশিদিন একে ধরে রাখা যাবে না। যে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ ঝাঁ চকচকে জীবনচর্যা কে আমরা ভারতীয় মধ্যবিত্তের সামনে তুলে ধরছি আদর্শ হিসাবে, তা কিন্তু আমরা সত্যি সত্যি দিতে পারব না। ভারতের সমস্ত মধ্যবিত্তকে পশ্চিমী স্টাইলের জীবনযাপন পদ্ধতি উপহার দেওয়া আমাদের পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দিয়েও কুলোবে না। তাই কিছু মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া করে সেখানে উন্নয়নের তাসের ঘর তৈরি করা চলে না। এখন দেশের সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ কোনও বাইরের শত্রু নয়, সবচেয়ে বড় বিপদ আমাদের নিজেদের ব্যর্থতা—সমস্ত নাগরিককে মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার প্রতিশ্রুতি দিতে না পারার ব্যর্থতা। যেভাবে মাওবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে, তা প্রধানমন্ত্রীর কথামতো দেশের নিরাপত্তার অভাববোধের প্রতিফলন নয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা ও তার কর্পোরেটভজা নীতি দরিদ্রতমদের যে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কোণঠাসা করে দিয়েছে, তারই বহিঃপ্রকাশ। গায়ের জোরে একে দমন করতে চাইলে তা আমাদের গণতন্ত্রের ভিতকেই দুর্বল করবে।

ভারতের সমাজ এখন যে ভয়ঙ্কর একটা বিভাজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে মিলিটারি শক্তি দিয়ে সামাল দেওয়া যাবে না। গণতন্ত্রের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা

জানিয়ে দেশের সব মানুষের কথা শুনতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এটাই সত্যকে মোকাবিলা করার একমাত্র উপায়, আর দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের প্রশ্নকেও সামনাসামনি বুঝে নেওয়ার উপায়।

এখনও আমাদের একটাই ভরসাস্থল, সেটা হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। যদি দেখা যায় প্রতিটি ভোটের পিছনে যে একটি করে মানুষ আছে, তারা প্রত্যেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতটা অংশগ্রহণ করছে, তাহলে বোঝা যাবে কী ভয়ঙ্করভাবে একটা শ্রেণী বাকী শ্রেণীগুলোকে বঞ্চিত করে বা তাদের অধিকার হরণ করে নিজেদের পুষ্ট করছে। আরও বোঝা যাবে যে প্রতিটি উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত কত যত্ন করে, ভেবেচিন্তে রূপায়িত করা দরকার। প্রতিটি মানুষের মতৈক্য ও স্বশাসনের ক্ষমতাকে মর্যাদা দিয়েই রূপায়িত করা দরকার। যদিও ত্রুটিশূন্য নয়, তবু এই গণতন্ত্রই আমাদের এখনও বহু দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে—নাগরিকদের বহুত্বকে মর্যাদা দিয়ে, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা দরকার। প্রতিবাদের ভাষাকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা শুধু অসম্ভবই নয়, অত্যন্ত মূর্খতাও। আমরা যদি প্রতিবাদীদের কণ্ঠস্বর বিনম্রতার সঙ্গে শুনতে চেষ্টা করি, তাহলে দেখব তাদের বোধ ও চিন্তাধারা কত মৌলিক, কত যুক্তিসঙ্গত ও কত গুরুত্বপূর্ণ।

(লেখকদ্বয় মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠনের কর্মী। মূল লেখা দি ইকনমিক টাইম্‌স, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এর কলাম থেকে অনুবাদ করেছেন সুমিত্রা)

নতুন প্রজাতন্ত্র নেপাল

নতুন প্রজাতন্ত্র নেপালে মাওবাদী নেতা পুষ্পকমল দহল ওরফে 'প্রচণ্ড' প্রধানমন্ত্রী পদে আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথগ্রহণ করলেন গত ১৮ আগস্ট ২০০৮। চাপা ও ছাপার খেলায় পারদর্শী খবরের কাগজগুলো যথাসম্ভব কম গুরুত্ব দিয়ে এসেছে এতদিন নেপালের খবরকে। নেপালের রাজার বন্ধু ভারত সরকার, নেপালে রাজতন্ত্রের অবসানকে খুব আনন্দের খবর বলে মনে করবে না, এটাই স্বাভাবিক। আর কর্তাভজা মিডিয়াগুলোও তাই যতদিন পেরেছে বলে গেছে যে মাওবাদীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যাই হোক আমরা দেখলাম শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে কীভাবে শেষ পর্যন্ত ২৮ মে ২০০৮ নেপালে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল।

আর তারপর শপথগ্রহণের পর থেকেই একটু একটু করে উঠে আসছে প্রচণ্ডের নাম। এটাই জয়। একটা মতবাদের জয়। একটা ভাবাদর্শের জয়।

'নার্কো টেস্ট' কী?

সুমিত্রা পদ্মনাভন

নার্কো টেস্ট বা নার্কো অ্যানালিসিস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি প্রথম টি.ভি দেখে। সারাদিন ধরে দেখানো হয়েছিল স্ট্যাম্প পেপার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আবদুল করিম তেলগির নার্কো-অ্যানালিসিস। যারা দেখেছিলাম, তারা জানলাম নার্কো টেস্টে, অভিযুক্তকে হাসপাতালের মতো একটা পরিবেশে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। তারপর তাকে গালে আস্তে চাপড় মেরে মেরে ঘুম একটু ভাঙিয়ে প্রশ্ন করা হয়। না, ঘুম পুরো ভাঙে না— সম্মোহন ঘুমের মতো একটা আধো ঘুম, আধো জাগা অবস্থায় সরলভাবে সেই মানুষটি জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে থাকে মনের কথা, দিতে থাকে প্রশ্নের উত্তর।

বাঃ চমৎকার ব্যবস্থা! ওষুধের সাহায্যে সম্মোহন ঘুমের অবস্থাটি তৈরি করা হয়। ওষুধের পরিমাণই ঠিক করে কখন ঘুম ভাঙবে। তাই হঠাৎ জেগে যাওয়ার ভয় নেই। আর মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গোপন কথা যেমন মানসিক রোগীরা সম্মোহিত অবস্থায় বলে ফেলে, ঠিক তেমনই, এক্ষেত্রে সম্ভাব্য অপরাধী বা তার সাকরেদরা সত্য গোপন না করে সব কথা শিশুর সারল্যে বলে যায়। ব্যস্— কেল্লা ফতে। এতদিনে আরও যাদের যাদের ওপর এই 'সত্যকথন দাওয়াই' প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আছে চন্দনদস্যু বীরাপ্পনের সাঙ্গপাঙ্গরা, নিঠারী কাণ্ডের ও আরুশি হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তরা, আবু সালেম ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে অভিযুক্তরা তো আছেই। পুলিশকে শুধু একবার বলতে হয়— যে আসামী সহযোগিতা করছে না, তাই কোনও কথা বের করা যাচ্ছে না। তখনই কোর্ট নার্কো অ্যানালিসিস করার অনুমতি দেয়। সঙ্গে থাকেন বিজ্ঞানীরা। এই সমস্ত পরীক্ষাই হয় ব্যাঙ্গালোরে ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি বা FSL-এর তত্ত্বাবধানে।

ভারতে গত আট বছর ধরে এই নার্কো-অ্যানালিসিস পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে অপরাধের তদন্তের কাজে। তদন্তের সময় অভিযুক্তকে, প্রত্যক্ষদর্শী বলে যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদেরকে বা অভিযুক্তের কাছের ও পরিচিত মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই হয়। তাদের বয়ান থেকেই অপরাধের নানান সূত্র বেরিয়ে আসে। কিন্তু মানুষের জটিল মস্তিষ্ক মানুষকে শিখিয়েছে মিথ্যা বলতে, অভিনয় করতে, মিথ্যাকে সত্য বলে হলফ করতে। আদালতে গীতা, বাইবেল ইত্যাদি ছুঁয়ে

'সত্য বই মিথ্যা বলিব না' প্রতিশ্রুতির পরও চোখের পাতা না ফেলে, সোনামুখ করে নিপাট মিথ্যে কথা বলে যেতে পারে মানুষই। সত্যি বলানোর জন্যে তাই এত ব্যবস্থা।

কীভাবে হয় নার্কো টেস্ট?

* প্রথমে অভিযুক্তকে বসানো হয় **'লাই-ডিটেক্টর'-পরীক্ষায়**। এর জন্য FSL-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক এই পরীক্ষায় রক্তচাপ, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি আরও কয়েকটি শারীরিক উপসর্গ পরিমাপ করে আন্দাজ করা হয় যে অভিযুক্ত সত্যি কথা বলছে না।

* এর পর হয় **'ব্রেন ম্যাপিং'**। তাতে মস্তিষ্কের কিছু পরীক্ষা করে আবারও নিশ্চিত হওয়া হয় যে অভিযুক্ত কিছু তথ্য গোপন করছে।

* তৃতীয় ধাপে অভিযুক্তকে **সরাসরি হাসপাতালে** নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে দেন যে মানুষটি নার্কো টেস্ট দিতে শারীরিক ভাবে প্রস্তুত, বা সুস্থ।

এরপর যে-কোনও বড় অপারেশনের মতো অভিযুক্তকে ও.টি. বা অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে কনসেন্ট ফর্ম-এ সই করিয়ে নেওয়া হয়; অর্থাৎ সে স্বেচ্ছায় এই টেস্ট দিতে যাচ্ছে। তারপর অ্যানাস্থেটিস্ট তাকে 'ইন্ট্রাভেনাস ড্রিপ' বা ধমনীর মধ্যে দিয়ে ইঞ্জেকশনের মতো করে ফোঁটায় ফোঁটায় অজ্ঞান করার ওষুধ প্রয়োগ করেন।

এই রাসায়নিকটির নাম পেন্টোথাল সোডিয়াম (pentothal sodium)। রোগীকে পুরোপুরি অজ্ঞান করতে যে পরিমাণ অ্যানাস্থেশিয়া দিতে হয়, নার্কো টেস্টে তার পাঁচ থেকে দশ ভাগ ওই একই রাসায়নিক দেওয়া হয়। এতে অভিযুক্ত অজ্ঞান না হয়ে একটা আচ্ছন্নের মতো অবস্থায় চলে যায়।

অপারেশন থিয়েটারে থাকেন একজন ফরেন্সিক সাইকোলজিস্ট বা মনস্তত্ত্ববিদ—যিনি অভিযুক্তকে প্রশ্ন করেন, অ্যানাস্থেটিস্ট, যিনি ওষুধটা প্রয়োগ করেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন, একজন ডাক্তার যিনি রক্তচাপ, হৃৎপন্দন ইত্যাদির দিকে লক্ষ রাখেন এবং অন্যান্য অ্যাসিস্ট্যান্টরা। কোনও কারণে অভিযুক্তের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। আচ্ছন্ন অবস্থায় প্রশ্ন করেন ফরেন্সিক সাইকোলজিস্ট। তিনি আগে থেকে অপরাধের তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশ্নের তালিকা তৈরি করে রাখেন।

প্রথম ধাপে সাধারণ প্রশ্ন করা হয়। যেমন, নাম কী, কোথায় জন্মেছেন ইত্যাদি, যেগুলোর উত্তর তখনই যাচাই করে নেওয়া যায়। এরপর যখন দেখা যায় অভিযুক্ত সম্পূর্ণ সম্মোহিত হয়ে ঘোরের মধ্যে কথা শুনছেন ও বলছেন, তখন শুরু হয় আসল প্রশ্ন—অপরাধ সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী।

সাধারণভাবে অভিযুক্তরা এই অবস্থায় গড় গড় করে কথা বলে যান। কেউ কেউ আবার ঘুমিয়ে পড়েন বা পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তখন তাদের চাপড় মেরে ঘোর কাটিয়ে আবার আধা ঘুম অবস্থায় এনে প্রশ্ন করা হয়।

এখন আশ্চর্য কথা হচ্ছে যে, আমরা যখন এই পরীক্ষাকে একটা নব আবিষ্কৃত, নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মনে করছি, অন্যান্য উন্নত দেশ কিন্তু তা করছে না। অন্য অনেক দেশ, যার মধ্যে আমেরিকাও আছে, অপরাধী চিহ্নিত করার এই পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক না অনির্ভরযোগ্যই শুধু বলছে না, অমানবিক বা বর্বরোচিত বলে তা বাতিলও করে দিয়েছে। আমেরিকার CIA বা সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি এটাকে ১৯৭৭ এই নাকচ করে দিয়েছে।

অথচ ভারতে ইতিমধ্যে ৭০০ জনেরও বেশি অপরাধে অভিযুক্ত মানুষকে নার্কো টেস্ট করা হয়েছে। এই 'অবৈজ্ঞানিক' পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েই চলেছে অপরাধ জগতের তদন্তের কাজে। ব্যাপারটা কী?

প্রথমে দেখি অমানবিক বলার কারণ কী? অনেকে বলছেন, যেমন মানবাধিকার কর্মীরা, যে এটা একরকমের মানসিক অত্যাচার। এই কারণটাকে হাস্যকর মনে হয় যখন দেখি বিচারাধীন আসামীদের জেলের ভেতর শারীরিক অত্যাচার এখানে প্রায় জলভাত। অকথ্য শারীরিক অত্যাচারের নানারকম কায়দা আমরা অনেকেই শুনেছি। বরফের ওপর শুইয়ে রাখা, উল্টো করে ঝুলিয়ে পায়ে লাঠির বাড়ি মারা, ইঁদুর দিয়ে মুখ চোখ পেট ইত্যাদি খুবলে নেওয়া, নখের ফাঁকে সূচ ফোটানো, কম্বল ধোলাই বা নেহাতই খোলামেলা বেধড়ক মার। এছাড়া আছে চোখে কড়া আলো ফেলে একা ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা। এগুলো কোনটা মানবিক? আর আমরা কি হলফ করে বলতে পারি কতজন অভিযুক্ত নির্দোষ হয়েও শুধু মারের চোটে, আরও অত্যাচারের ভয়ে বা বাড়ির লোকেদের উপর আরও ভয়াবহ হামলার ভয়ে—মিথ্যে মিথ্যে নিজেকে দোষী বলে স্বীকার করে নেয়? শাস্তি মেনে নেয়? জেলে পচে? এসবের কাছে নার্কো টেস্ট তো রীতিমতো আরামদায়ক! তেলগি তো শুনেছি এত আরাম পেয়েছিল, যে আবার টেস্ট দেওয়ার জন্য আবদার ধরেছিল।

FSL-এর ডিরেক্টর ডা: মোহন বলছেন "এটা যদি অত্যাচার হয়, তাহলে সর্বাগ্রে মনস্তাত্ত্বিকরা মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি বন্ধ করুন। তেলগি তো এই পরীক্ষার পর মানসিকভাবে এত নিশ্চিন্ত ও ভারমুক্ত বোধ করছিল যে আবার পরীক্ষায় যেতে চাইছিল।" ডা: মোহন আরও বলছেন যে এই পরীক্ষায় কোনও শারীরিক ক্ষতি হয় না এবং প্রশ্ন করেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরাই, তাই মানসিক আঘাতের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। এখন পর্যন্ত ৭০০-৮০০ ব্যক্তির উপর এই পরীক্ষা

চালানো হয়েছে ও তার মধ্যে ২৫% কে নিরপরাধ ঘোষণা করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তবু দেশে ও বিদেশে এখনও এই নার্কো টেস্ট 'বিজ্ঞান'-এর তকমা পায়নি। এখনও কোনও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে এই বিষয়ে কোনও প্রমাণিত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি। তবে ডা: মোহনের কথায়—এত তথ্য ও পরিসংখ্যান রয়েছে যে শিগ্‌গিরই উনি বিজ্ঞানের দরবারে সেগুলো পেশ করবেন এবং তথ্য প্রমাণ-সহ একটা মাপকাঠি নির্ধারণ করে বিষয়টাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'স্ট্যান্ডার্ডাইজ' করতে পারবেন বলে আশা করছেন।

তাহলে কেন অন্যান্য দেশ নার্কো অ্যানালিসিসকে বাতিল করেছে? (১) পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত নয় এখনও, (২) ডাক্তারি পেশার এক্তিয়ারে পড়ে না, যেহেতু এক্ষেত্রে কোনও রোগ সারানো নয়, অপরাধীকে ধরার ও শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, (৩) সব সময় নির্ভুল হয় না কারণ অনেকে সম্মোহনের ঘোরে ইলিউশন বা ডিলিউশনের শিকার হয়ে ভুল বলেন বা কল্পিত কিছু কথা বলেন।

এ বিষয়ে প্রাক্তন আই পি এস অফিসার কিরণ বেদী কী বলছেন শুনি।

'সবসময় নির্ভুলভাবে না হলেও এই পদ্ধতি যথেষ্ট উপযোগী। এখনও সময়ের পরীক্ষায় পাশ হয়নি, আদালতও এখনও ছাড়পত্র দেয়নি। তবু নার্কো টেস্ট সত্য উদ্ঘাটনে অনেক সময়ই যথেষ্ট সাহায্য করে। পদ্ধতিটাকে নিয়মের মাপকাঠিতে এনে একটা স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষা হিসাবে আদালতের কাছে পেশ করতে হবে। ওটাই শেষ কথা হবে কি না, তা ঠিক করবে আদালত, অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ করার পর।

যাই হোক, ততদিন আমরা কিরণ বেদীর কথায় একমত হয়ে বলতেই পারি যে শারীরিক অত্যাচারের চেয়ে নার্কো অ্যানালিসিস্ অনেক মানবিক একটি বিকল্প। অপরাধের সূত্র পেলে তবে তো তথ্যপ্রমাণ খোঁজা হবে ও পাওয়া যাবে। যেমন, কোনো অপরাধী যদি সম্মোহন ঘুমের মধ্যে বলে—'হাঁ, আমি খুন করেছি। ছুরিটা ফেলেছি পাশের ঝোপে।' তাহলে নিশ্চয়ই তার কথার ভিত্তিতে তার শাস্তি ঘোষণা হবে না। তখন ছুরিটা খোঁজা হবে। যদি সত্যি সেটা পাওয়া যায় ও তারপর অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি— যেমন আঙুলের ছাপ, DNA পরীক্ষা ইত্যাদি সব কিছু মেলানো যায়, তবেই অন্তিম সিদ্ধান্ত ঘোষণা হবে। তাই 'অবৈজ্ঞানিক' বলে উড়িয়ে না দিয়ে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে এগোনো সম্ভব মানুষের সদিচ্ছা থাকলে।

মানুষের সদিচ্ছাই পারে সব পদ্ধতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে সত্যে পৌঁছতে।

ন্যানো রাজ্যের পক্ষে লাভজনক না বিপজ্জনক

হরলাল চক্রবর্তী

টাটা মোটরসের অত্যাশ্চর্য একলাখি মোটর গাড়ি সিঙ্গুর থেকে বের হবে, সারা বিশ্ব সেদিকে তাকিয়ে আছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা এমন অত্যাশ্চর্য গাড়ি রাজ্য থেকে বের হবে বলে গর্বিত। এই গর্বে ভাগীদার হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর তার সুযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন মরণপণ করে অন্যান্য রাজ্যকে হারিয়ে দিয়ে এই শিল্পখরার রাজ্যে টাটাকে কারখানা স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

সম্প্রতি ওয়েবসাইটে WBIDC টাটার সঙ্গে চুক্তির কিয়দংশ প্রকাশ করেছে, যদিও আরও অনেক কিছু ট্রেড সিক্রেটের আড়ালে অপ্রকাশিত। তবুও ওইটুকুর ভিত্তিতেই এই চুক্তির আর্থিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এখানে সিঙ্গুরের হাজার একর চারফসলি জমি নষ্ট করা বা চাষিদের কী সর্বনাশ হল তা বিচার করা হয়নি, ওই চুক্তির জন্য রাজ্যকে কী মূল্য দিতে হবে তাই শুধু বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার WBIDC-র মাধ্যমে সিঙ্গুরে ৯৯৭.১১ একর জমি অধিগ্রহণ করে রেকর্ড করে রাইটসকে কৃষি থেকে শিল্পে রূপান্তরিত করবে; টাটাদের কারখানার জন্য দেওয়া হবে ৬৪৫.৬৭ একর, টাটাদের অনুমোদন সাপেক্ষ সহযোগী শিল্পদের (Ancillary & Component Manufacturers) ২৯০ একর, WBIDC-কে সাবস্টেশান তৈরির জন্য ১৪.৩৩ একর, আর WBIDC-র হাতে জমিহারা দুস্থদের পুনর্বাসনের জন্য থাকবে ৪৭.১১ একর।

পশ্চিমবঙ্গ ইন্সেন্টিভ স্কিম (WBIDC ২০০৪) অনুযায়ী জমির দাম আর সুদে টাটাদের ভর্তুকি নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া হবে।

ক) পূর্ববর্তী বছরে ভ্যাট এবং সেন্ট্রাল সেল ট্যাক্স ৩১ মার্চ থেকে ষাট দিনের মধ্যে টাটাদের ০.১ শতাংশ সুদের হারে দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে ধার দিতে হবে। এটা চলবে যত দিন না এটা উত্তরাখণ্ডের দেওয়া সুবিধার সমান হচ্ছে। প্রতি বছর এই টাকা লোন হিসাবে টাটাদের দিতে দেরি হলে ব্যাঙ্ক রেটের দেড়গুণ হারে সুদ দিয়ে আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই লোন দেওয়া কতদিন চলবে তা বোঝা গেল না। প্রথম বছরের ধার ৩১ তম বছরে, দ্বিতীয় বছরের ধার ৩২ তম বছরে, এইভাবে ধার ফেরত দেওয়া চলতে থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, সরকারের এই যে ভ্যাট এবং সেন্ট্রাল সেল ট্যাক্স নেওয়া এবং ধার হিসাবে দেওয়ার জন্য যে হ্যান্ডলিং কস্ট সেটা কিন্তু নেওয়া হবে না। আমি হিসাবের সময় গাড়ি-প্রতি ভ্যাট ও সিএসটি ষোলো হাজার টাকা হবে এমন ধরে নিয়েছি। এই হিসাবে রাজ্য সরকার যে পরিমাণ টাটাদের অর্থমূল্য দিচ্ছে ১১ শতাংশ হিসাবে সুদ ধরে তার আজকের মূল্য ৫৪৫৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

খ) টাটা মোটরকে জমি ৯০ বছরের লিজে দিবে। বার্ষিক লিজ হবে, প্রথম পাঁচ বছর, প্রতি বছর এক কোটি টাকা হারে তারপর তিরিশ বছর পর্যন্ত প্রতি পাঁচ বছর অন্তর লিজ ভাড়া বাড়বে ২৫ শতাংশ করে।

৩১ তম বছর থেকে ৪০ তম বছর পর্যন্ত ভাড়া হবে প্রতি বছর পাঁচ কোটি টাকা করে এবং ষাট বছর পর্যন্ত প্রতি দশ বছর অন্তর তিরিশ শতাংশ ভাড়া বাড়বে। একষট্টি থেকে নব্বই বছর পর্যন্ত লিজ ভাড়া হবে প্রতি বছর কুড়ি কোটি টাকা। এগারো শতাংশ সুদ ধরলে এই নব্বই বছর ধরে দেওয়া টাকার আজকের মূল্য হয় পনেরো কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকা, অর্থাৎ কাঠা প্রতি চার হাজার একশো তিরিশ টাকা।

গ) WBIDC টাটা মোটরস্‌কে চুক্তি সই করার ষাট দিনের মধ্যে দু'শো কোটি টাকা এক শতাংশ হারে সুদে টাকা ধার দেবে; তা পাঁচটি সমান কিস্তিতে শোধ করা হবে, প্রথম কিস্তি দেওয়া হবে ধার গ্রহণের ২১ তম বছর থেকে। বাকি কিস্তিগুলি কোন কোন বছরে শোধ করা হবে বলা হয়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে সেগুলি ৩৮তম, ৫৫তম, ৭২তম এবং ৮৯তম বছরে শোধ করা হবে। এর ফলে WBIDC যে পরিমাণ অর্থমূল্য দিচ্ছে ১১ শতাংশ হিসাবে সুদ ধরে তার আজকের মূল্য দাঁড়ায় ১৯২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা।

ঘ) টাটা মোটরস্‌কে তিন টাকা কিলো ওয়াট দরে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে এবং প্রতি পাঁচ বছরে মাত্র ২৫ পয়সা করে তা বাড়ানো যাবে; এর অতিরিক্ত প্রকৃত বৃদ্ধি যা হবে তা রাজ্য সরকার বহন করবে। কত বছর ধরে এটা চলবে তার উল্লেখ করা হয়নি; তাই ধরা যেতে পারে এটা চুক্তির বয়স ৯০ বছর পর্যন্তই চলবে।

শিল্পে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে দু'টো ভাগ থাকে, (১) ডিমান্ড এবং (২) এনার্জি। মোটামুটিভাবে শিল্পে বিদ্যুতের হার হয়ে থাকে প্রতি ইউনিট প্রতি ছয় থেকে সাত টাকা। এবং প্রতি ইউনিট ছয় টাকা করে ধরে এবং প্রতি বছর পাঁচ শতাংশ হারে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে এবং টাটা মোটর যদি তিরিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নেয় তাহলে রাজ্য সরকারকে মোট যে পরিমাণ ভর্তুকি দিতে হবে তা হিসাব করা হয়েছে, এবং তার আজকের মূল্য ১৭৮৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা।

ন্যানোর জন্য রাজ্য সরকারের যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হচ্ছে টাটাদের জমির জন্য ১৫ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে তার আজকের মোট মূল্য দাঁড়াবে আজকের মূল্যে ৭৪২১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। **অর্থাৎ টাটাদের ১৫০০ কোটি টাকার কারখানা করার জন্য রাজ্য সরকার ৭৪২১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করতে যাচ্ছে। এর মধ্যে অবশ্য জমি অধিগ্রহণের খরচ, প্রাচীর বানানোর খরচ, পাহারাদার নিয়োগের খরচ, হাজার হাজার পুলিশ নিয়োগ করে সিঙ্গুরবাসীদের পেটানোর খরচ, এসব ধরা হয়নি।**

যে-কোনও প্রোজেক্টের আর্থিক বিশ্লেষণ করার সময় দু'টো জিনিস দেখা হয়, (১) আজকের মূল্য (Net Present Value) (২) ক্যাশ ফ্লো, অর্থাৎ প্রোজেক্টের যে কোন সময় কত টাকা আছে। সেটাও করা হয়েছে, তা হল চতুর্থ বছরের শেষে টাটা মোটরসের থাকবে ১৮১৩ কোটি টাকা, পাঁচ বছরের শেষে থাকবে ৫৬০৩ কোটি টাকা, ২০তম বছরের শেষে থাকবে ১১৯ক৬২ কোটি টাকা, ৩০তম বছরের শেষে থাকবে ১৮৪১৫ কোটি টাকা। আর এই টাকা কিন্তু জোগাবে রাজ্য এই রাজ্যের কর দাতাদের এবং অন্যান্য শিল্পপতিদের মূল্যে।

সিঙ্গুরে গাড়ির কারখানার ব্যাপারে বিভিন্ন বিশিষ্টজনেরা যে এত সমর্থন জানাচ্ছেন, তাদের এই প্রোজেক্টের Net Present Value এবং ক্যাশ ফ্লো অ্যানালিসিস করে একটু দেখতে অনুরোধ করব।

(সৌজন্যে দৈনিক স্টেটসম্যান : লেখক দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার)

সংবাদ প্রতিদিন ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮

পৃথিবী ধ্বংসের সিডি বাজারে, আন্দোলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : ২০১২সালে পৃথিবী ধ্বংসের নিশ্চয়তা দাবি করে বাজারে ছড়িয়ে পড়ল সিডি। আর তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। পুরুলিয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কমিটি ওইসব সিডি বাজেয়াপ্ত করার দাবিতে জেলা পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়া জেলা কমিটি ওই সিডির কপি তাদের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠিয়েছে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক মহসুদন মাহাত বলেন, "কয়েক দিন আগে সমিতির হাতে একটি সিনেমার সিডি আসে। যাতে পৃথিবী ধ্বংসের কারণ বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর ওই ফুটেজগুলিকে ব্যবহার করে সিডি বন্দি করে বেআইনিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাজারে। সংগঠনের অভিযোগ, ওই সিডিগুলো ১০ থেকে ২০ টাকাতে খোলা বাজারে রমরমিয়ে বিক্রি হচ্ছে। বিভিন্ন ক্যাসেট দোকানদার সেগুলোকে ২০টাকায় ভাড়া দিচ্ছে। পুরুলিয়ার মতো পিছিয়ে পড়া জেলার সাধারণ হত দরিদ্র এবং নিরক্ষর থেকে আধা-শিক্ষিত এমনকী শিক্ষিত সমাজ সেই সিডি বাড়িতে নিয়ে এসে সপরিবারে, পড়শিদের নিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে দেখছেন। তারপর অজানা আতঙ্কে শঙ্কিত হয়ে উঠছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা জানিয়েছেন, "পৃথিবী ধ্বংসের আগাম খবর পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে দেশের দু'জন জ্যোতিষী বয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।" সংগঠনের দাবি, ওই সব জাল সিডি বিক্রেতাদের গ্রেফতার করতে হবে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শ্যামল সরকার বলেন, "স্মারকলিপি পেয়েছি। এই সংগঠনটি সিডিও দিয়েছে। তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছি। জেলাশাসককে গোটা বিষয়টি জানাব। যারা এই সিডি বিক্রি করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

আর যে সন্ত্রাস ঘরের পাশে?

তাপস সিংহ

সাত বছরে বহু বার দেখতে দেখতে ছবিটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। বিমান এসে সরাসরি ধাক্কা মারছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টাওয়ারে। সেই বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট সন্ত্রাসের ধোঁয়ায় এখনও আচ্ছন্ন বিশ্বের আকাশ। অতঃপর, আমরা ভাবতে শিখেছি, সন্ত্রাস বলতে আসলে এটাই। কিন্তু আজ, এই ৯/১১-য়, সন্ত্রাসের চিরচেনা ছবিটা যে তারিখে পাল্টে গেল, সেই তারিখে বসে কিন্তু সন্ত্রাসের আরও কিছু ছবি চোখে ভেসে ওঠে। সে সব আমাদের ঘরের সন্ত্রাস।

কত কিছুরই তো বর্ষপূর্তি হয়। ঘটা করে উদ্‌যাপন হয়। কিন্তু কার্যত নিঃশব্দে একটি আইন তার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছে এই দেশেই। আর একই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে ভারতীয় রাষ্ট্রের নিষ্ঠুরতারও পঞ্চাশ বছর। সংসদকে না জানিয়ে সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল জওহরলাল নেহরু সরকার। বিভিন্ন সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করেই তার পর সেই অর্ডিন্যান্স পাশ হয়ে যায় সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ারস অ্যাক্ট'৫৮) হিসেবে।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি যে তারিখে এই আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই তারিখটিও, ঘটনাচক্রে, ১১ সেপ্টেম্বর।

বস্তুত '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মোকাবিলায় ব্রিটিশ সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল, স্বাধীন ভারতে সেই অর্ডিন্যান্সই নতুন রূপে ফিরে আসে। এই কালা আইনের স্বাদ প্রথম পেয়েছিল দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। আশির দশকে জঙ্গি কার্যকলাপ রোধে এই আইন কিছু দিনের জন্য পাঞ্জাবে বলবৎ করা হয়। জম্মু-কাশ্মীরে তো সেই '৯০ সাল থেকে কায়েম রয়েছে এই আইন।

এই আইনের জোরেই সশস্ত্র বাহিনী কার্যত যা খুশি করছে বলে বারে বারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিযোগ উঠেছে। ২০০৪-এর ১৫ জুলাই মণিপুরে, সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকজন নারী অসম রাইফেলসের জওয়ানদের হাতে থাংজাম মনোরমার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। অসম রাইফেলসের সদর দফতরের সামনে দু'হাতে ফেস্টুন তুলে তাঁরা চিৎকার করেছিলেন, 'ভারতীয় সেনা, এসো, আমাদের ধর্ষণ করো।' সশস্ত্রবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং

উপদ্রুত এলাকা আইন রদের দাবিতে উত্তাল মণিপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই আইন সংশোধন করে আরও মানবিক রূপ দেওয়া হবে।

মনোরমার হত্যাকাণ্ডের পরে প্রবল বিক্ষোভ চাপা দিতে এই আইনের যাবতীয় দিক খতিয়ে দেখতে বিচারপতি বি পি জীবন রেড্ডি কমিটি গঠন করেছিল মনমোহন সিংহের সরকার। ২০০৫-এর ৬ জুন ওই কমিটির রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করা হয়। কিন্তু আজও তা সংসদে পেশ হয়নি। বীরাপ্পা মইলির নেতৃত্বে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটিও ২০০৭-এ এই আইনটি তুলে দেওয়ার সুপারিশ করে। ওই বছরই রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি কমিটি এই আইন প্রত্যাহার করার আর্জি জানায়।

এই প্রসঙ্গে আরও এক নারীর কথা মনে পড়ে। প্রায় আট বছর ধরে অনশনে সেই নারী। সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন রদের দাবিতে ২০০০ সাল থেকে অনশন চালিয়ে আসছেন ইরম শর্মিলা চানু। নাকে গোঁজা নল দিয়ে জোর করে তাঁকে খাওয়ানো হয়। যখনই সুযোগ পান তখনই হাত দিয়ে নাকের নল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এটাই তাঁর প্রতিবাদ। কীসের প্রতিবাদ? সে বছর সেনাবাহিনীর উপরে হামলা চালায় মণিপুরি জঙ্গিদের একটি গোষ্ঠী। এর পাল্টা হিসেবে অষ্টম অসম রাইফেলস মালোম বাসস্ট্যাণ্ডে গুলি চালালে দশ জন নিহত হন। পরের দিন স্থানীয় সংবাদপত্রে মৃতদেহগুলির ছবি দেখে তীব্র আবেগে আলোড়িত ইরম শর্মিলা অনশন শুরু করেন।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' একটি রিপোর্টে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কায়েম এই আইন প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

এই ৯/১১-য় ভুলে গেলে চলবে না সন্ত্রাসের আর একটি রূপের কথাও। গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাওবাদীদের নির্বিচার হিংসার মিছিল দেখে মনে হয়, ওসামা বিন লাদেন অথবা জর্জই শুধু সন্ত্রাস আর পাল্টা সন্ত্রাসের প্রতীক? বিবেকহীন, বোধহীন হিংসার রাজনীতির কারবারি যাঁরা, কিশোর সন্তানের সামনে, স্ত্রীর সামনে পুলিশের চর তকমা দিয়ে কাউকে খুন করে গাছে বেঁধে রাখেন যাঁরা, তাঁরা কি সত্যিই শোষণহীন, সন্ত্রাসহীন সমাজ তৈরির কারিগর?

সশস্ত্র বিপ্লবের কুশীলবেরা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতেই পারেন। প্রশ্নটা তাঁদের রাজনৈতিক লাইন নিয়ে নয়, প্রশ্নটা এই যুদ্ধে 'কোল্যাটেরাল ড্যামেজ'-এর। এই 'কোল্যাটেরাল ড্যামেজ' তো আমেরিকাও করেছে ইরাকে, আফগানিস্তানে। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী ঠিক সেটাই করে চলেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

আজ আতঙ্কের এই ভুবনজোড়া উদ্‌যাপন-পর্বে ঘরের পাশের সন্ত্রাসও যেন চোখ এড়িয়ে না যায়! *(সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা/১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮)*

উপভোক্তা বিষয়ক ও ন্যায্য বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার

ভারতীয় সংবিধান আমাদের দিয়েছে কিছু নাগরিক অধিকার, দুঃখের বিষয় এগুলো আমরা সকলে ঠিকমতো জানি না। অধিকারগুলো ঠিকঠাক বুঝে নিতে সেগুলো জানা প্রয়োজন, সেই চেষ্টাতেই আমাদের এই প্রতিবেদন

উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির হাত ধরে বিভিন্ন পণ্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে মানুষের চাহিদা পূরণে পৌঁছে যাচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে শুরু করে উচ্চ আয় সম্পন্নদের ভোগ্য বহুবিধ পণ্য ঘর থেকেই দু'হাত বাড়িয়ে পাওয়া যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিদিনই যেসব পণ্য বা পরিষেবা মানুষ ভোগ করছেন তার গুণমান, পরিমাণ ও মূল্যের ব্যাপারে সন্তুষ্টি অত্যন্ত জরুরি, এই সন্তুষ্টি পেতে হলে বা সন্তুষ্টি পেতে প্রতারিত হলে তার রক্ষা কবচ একজন ক্রেতা বা উপভোক্তা হিসাবে জেনে রাখা আপনার নাগরিক কর্তব্য।

সজাগ থাকুন :—

পণ্য কিংবা পরিষেবা কেনার সময় আপনার সামান্য সতর্কতা আপনাকে প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে পারে। কোন কোন বিষয়ে নজর রাখবেন।

১) মোড়কজাত পণ্য কেনার সময় দেখে নিন—(ক) মোড়কের ভিতরের সামগ্রীর নাম, (খ) প্রস্তুতকরণ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, (গ) সামগ্রীর প্রকৃত ওজন, আয়তন অথবা সংখ্যা, (ঘ) সর্বাধিক খুচরো বিক্রয় মূল্য (সমস্ত কর সমেত) এবং (ঙ) প্রস্তুতকারী সংস্থা বা ব্যক্তি এবং আমদানীকারী ব্যক্তি ও সংস্থার নাম ও পুরো ঠিকানা।

২) বিক্রেতার পরিমাপক যন্ত্রটি ও বাটখারাগুলি বৈধভাবে নবীকৃত কিনা অবশ্যই দেখে নিন।

৩) গায়ে মাখার সাবান, বৈদ্যুতিক, সরঞ্জাম, ব্যাটারি, শিশুখাদ্য, গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম, প্রেসার কুকার, গ্যাসের উনুন, সিলিণ্ডার ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম, নন্‌স্টিক কড়াই, ফ্রাইংপ্যান প্রভৃতি সামগ্রীতে Bureau of Indian Standard প্রদত্ত ISI ছাপ আছে কিনা দেখে কিনুন।

৪) সোনার গহনা কেনার সময় BIS প্রদত্ত Hall Mark দেখে কিনলে ঠকবার ভয় কম থাকে।

৫) চাল, গম, আটা, ডাল, মশলা, ভোজ্য তেল, মধু, ঘি, মাখন প্রভৃতি তজতনসের মোড়কে আগমার্ক রেপ্লিকা নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার প্রতীক।

৬) কৃষিপণ্য এ ফল থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যবস্তু যেমন জ্যাম, জেলি, আচার, শস, ফলের রস প্রভৃতি মোড়ক ছাপ ভারত সরকার প্রদত্ত উন্নত গুণমানের প্রতীক।

৭) মোড়কজাত আমিষ খাবারের প্যাকেটে M.F.P.O.-73 ছাপ দেখে নিলে গুণমান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

৮) রেশম বস্ত্রের বিশুদ্ধতার চিহ্ন 'সিল্ক মার্ক'।

৯) হাতে বোনা তাঁতে উৎপন্ন বস্তুর নিশ্চয়তার চিহ্ন 'হ্যান্ডলুম মার্ক'।

১০) উলের তৈরি জিনিসের বিশুদ্ধতার চিহ্ন 'উলমার্ক'।

১১) সমস্তরকম পণ্য বা পরিষেবা কেনার সময় রসিদ/বিল/ভাউচার অবশ্যই বিক্রেতার কাছ থেকে চেয়ে নিন।

ঠকলে পরে :—

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও যদি আপনি কোনও পণ্য ও পরিষেবা কিনে ঠকে যান তবে আপনি ভারত সরকারের 'উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬'ও উপভোক্তা সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০০২' অনুসারে প্রতিকার পেতে পারেন। বর্তমানে আমাদের দেশে যেসব সামাজিক অর্থনৈতিক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তার মধ্যে উপভোক্তা সুরক্ষা আইন দিক্‌দর্শন। এই আইনের মূল লক্ষ্য হ'ও ক্রেতার স্বার্থ অধিকতর সুরক্ষা বিধান করা, ক্রেতার অভিযোগের দ্রুত ও সুলভ প্রতিবিধান করা, এমনকী, ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।

কিন্তু আইন থাকলেই হবে না, কোথায় অভিযোগ দায়ের করতে হবে, এগুলোর জানা বিশেষ প্রয়োজন, নচেৎ আইনের পুরোপুরি সুফল পাওয়া যাবে না।

আপনি কখন ক্রেতা হিসাবে উপভোক্তা সুরক্ষা আইন-এর আওতায় প্রতিবিধান পাবেন?

আপনি নিজে ব্যবহারের জন্য যে-কোনও পণ্য বা পরিষেবা নগদমূল্যে, ধারে অথবা আংশিক নগদ ও আংশিক ধারে কিনে তার গুণমান, পরিমাণ, ওজন কিংবা মূল্যের ব্যাপারে প্রতারিত হলেই এই আইনের আওতায় ১২ ধারায় প্রতিবিধান পাবে।

কী কী ব্যাপারে আপনি এই আইনের সাহায্য পেতে পারেন?

আপনার অভিযোগের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সংক্ষেপে বলতে গেল বলতে হয়—ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, টেলিফোন, বিদ্যুৎ রান্নার গ্যাস, চিকিৎসা, ফ্রিজ, রেল, কেবল টিভি, ক্যুরিয়ার সার্ভিস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন অথবা

যে-কোনও অবসরকালীন সুবিধে না পাওয়ার জন্য মালিকের বিরুদ্ধে, বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ব্যক্তিগত হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে চিকিৎসা ও শল্যচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে), ইত্যাদি, বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগপত্র দায়ের করতে পারেন।

প্রতারিত ক্রেতা/ উপভোক্তা এই আইনে কি ধরনের প্রতিবিধান পেতে পারেন?

(ক) পণ্য কিংবা পরিষেবার ত্রুটি বা ঘাটতি দূরীকরণ, (খ) বদল, (গ) মূল্য ফেরৎ, (ঘ) ক্ষতিপূরণ, (ঙ) বাণিজ্য বা বিপণন ক্ষেত্র থেকে বিপজ্জনক বা অনিষ্টকারী সামগ্রী বা পরিষেবা অপসারণ ইত্যাদি।

প্রতারিত ক্রেতা প্রতিকার চেয়ে কোথায় আবেদন করবেন?

ক) যদি কোনও পণ্য বা পরিষেবার মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকার মধ্যে হয় তবে অভিযোগ জানাতে হবে District Consumer Disputes Redressal Forum-এ (সংশ্লিষ্ট জেলায়) (খ) যদি কুড়ি লক্ষ টাকার উপরে কিন্তু এক কোটি পর্যন্ত পণ্য বা পরিষেবাকে কেন্দ্র করে হয়, তবে অভিযোগ জানাবেন State Consumer Disputes Redressal Commission, Bhawani Bhawan, Alipore, Kolkata-700 027। (গ) যদি এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের পণ্য বা পরিষেবা সংক্রান্ত হলে অভিযোগ জানাতে হবে—National Consumer Dsiputes Redressal Commission, Janapath Bhawan, Wing-'A' 9th Floor, New Delhi-110 001।

এছাড়া প্রতারিত ক্রেতা অভিযোগ জানাতে পারেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা বিষয়ক দপ্তরের অধীনে—"Directorate of Consumer Affairs & Fair Business Practices" এর আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিতে অথবা মুখ্য কার্যালয়ে।

কীভাবে আবেদন করবেন?

তিন থেকে পাঁচ কপি সাদা কাগজে আবেদন করবেন। দরখাস্ত উল্লেখ করবেন—(ক) অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা, (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, (গ) পণ্য বা পরিষেবার নাম পরিমাণ, মূল্য ও ক্রয়ের তারিখ, (ঘ) কোন বিষয়ে প্রতারিত হয়েছেন এবং (ঙ) কী ধরণের প্রতিবিধান চাইছেন। অভিযোগ পত্রের সঙ্গে বিল/ভাউচার/রসিদ সংযোজন করা বাঞ্ছনীয়। **কত দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করতে হবে**—ঘটনা ঘটার দু'বছরের মধ্যে অভিযোগ জানাতে হবে।

প্রতিকার পাওয়া যাবে কত দিনে?—বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ছাড়া প্রতিকার পাওয়া যায় নব্বই দিনের মধ্যেই।

এই আইনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল :—(ক) প্রতারিত ক্রেতা নিজেই অভিযোগ জানাতে পারেন। (খ) সামান্য কোট ফি লাগে, (গ) এফিডেভিট করতে হয় না, (ঘ) উকিল নিয়োগ বাধতামূলক নয়। এমনকী, শুনানির সময় ক্রেতা নিজেই নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারেন। সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ প্রতিকার প্রাপ্তির পুরো প্রক্রিয়াটাই সামান্য ব্যয়ে সম্পূর্ণ করা যায়।

মনে রাখবেন, আপনার সতর্কতা এবং সচেতনতাই অসাধু বাণিজ্যের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

মনে রাখবেন :—

তুচ্ছ কারণে বা হয়রানি করার উদ্দেশ্যে অভিযোগ করলে অভিযোগকারীরই জরিমানা হতে পারে। সহ-অধিকর্তার অফিস ছাড়াও জেলার প্রতিটি মহকুমা শাসকের অফিসে অভিযোগ জানানো যেতে পারে।

(সংগ্রহে সোনা শেখ, মুর্শিদাবাদ)

নেপাল প্রসঙ্গে প্রবীর

আজ থেকে দু' বছর আগে প্রবীর ঘোষ তার 'নেপাল : স্বয়ম্ভর গ্রাম গড়ার আন্দোলন থেকে মাথা তুলছে সাম্যবাদ' রচনায় লিখেছিলেন— "আমরা করব জয় নিশ্চয়।"

জনগণতান্ত্রিক এই অসাধারণ বিপ্লবের গতি থামাবার সাধ্য কারও নেই। না, এটা আবেগের কথা নয়। সঠিক নেতৃত্ব যে মস্তিষ্ক যুদ্ধে নেমেছে, তাতে আমেরিকা ও তার বন্ধু দেশগুলো বুঝতে পারছে লড়াই জেতা তাদের পক্ষে একটু একটু করে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। (আমরা যুক্তিবাদী, মে, ২০০৬ সংখ্যা)

"সেখানেই জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সমবায় গড়ে ওঠে, সেখানে দুর্নীতি থাকে না, থাকতে পারে না। এই স্বয়ম্ভর গ্রাম বা সমবায়গুলোই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ও দুর্নীতি উচ্ছেদে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকে। এইসব স্বরাজের প্রতিষ্ঠা মানেই সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির অবলুপ্তি।"—প্রবীর ঘোষ

তথ্য জানার লড়াইয়ে জিত, জরিমানা পঞ্চায়েত-সচিবের

প্রশান্ত পাল

পুঞ্চার পরে আড়শা।

কার্তিক রাজোয়াড়ের পর গোপাল মাহাতো আর সুনীল সহিস। ফের নেতা-প্রশাসনের সঙ্গে লড়ে তথ্য জানার অধিকার ছিনিয়ে নিলেন পুরুলিয়ার দুই বাসিন্দা।

ঘটনাস্থল আড়শার হেঁসলা পঞ্চায়েত। স্থানীয় শালইডহর গ্রামের কৃষক সুনীল সহিস ও হেঁসলা গ্রামের দিনমজুর গোপাল মাহাতো ১০০ দিন কাজের প্রকল্প এবং ইন্দিরা আবাস যোজনার তথ্য জানতে চেয়েছিলেন পঞ্চায়েতের কাছে। নানা অজুহাতে পঞ্চায়েত বিষয়টি এড়িয়ে যায়। এর পরেই তথ্য কমিশনের দ্বারস্থ হন ওই দু'জন। শুনানির পরে কমিশন তথ্য জানার আইন অবমাননার দায়ে হেঁসলা পঞ্চায়েতের সচিব সন্তোষ বাউরিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান (নির্দল) বিজলা সহিসকেও শো-কজ করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার গ্রামের বাড়িতে বসে সুনীলবাবু বলেন, "গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ১০০ দিন কাজের প্রকল্পে রসিকটাঁড় মোড় থেকে শালইডহর পর্যন্ত রাস্তা হচ্ছিল। হঠাৎ কাজ বন্ধ। পঞ্চায়েতে গিয়ে কারণ জানতে চাই। এক জন বললেন, 'যেখানে কাজ হবে সেখানে বোর্ড দিয়ে জানানো হবে। পড়ে নেবেন।' কিন্তু বোর্ড কোথায়?" গত সেপ্টেম্বরে তিনি ওই প্রকল্পের মাস্টার রোল ও অন্যান্য তথ্য চেয়ে পঞ্চায়েতে আবেদন করেন। একই দিনে গোপাল মাহাতোও পঞ্চায়েতের কাছে জানতে চান, এলাকায় ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রকল্পে গত চার বছরে কারা উপকৃত হয়েছেন। তাঁর কথায়, "দেখলাম, দীর্ঘদিন ধরে যাঁদের মাথায় ছাদ নেই তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই আসল তথ্য জানতে চেয়েছিলাম।"

পঞ্চায়েত কর্ণপাতও করেনি। বাধ্য হয়ে মাসখানেক পরে বিডিও-র কাছে আবেদন করেন ওঁরা দু'জন। নভেম্বরে তাঁদের ব্লক অফিসে শুনানিতে ডাকা হয়। সুনীলবাবুর কথায়, "বিডিও-র সামনেই পঞ্চায়েতের সচিব লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন, তথ্য দেবেন। সেই মতো আমি ও গোপালবাবু পঞ্চায়েতে ফি জমা দিতে যাই। কিন্তু যত বারই গিয়েছি, ওঁর দেখা পাইনি। তাই ফের বিডিও-কে জানাই। তাঁরই হস্তক্ষেপে ডিসেম্বরের গোড়ায় সন্তোষবাবু আমার কাছ থেকে ৮০ টাকা ও

গোপালবাবুর কাছ থেকে ২০ টাকা ফি নেন। কিন্তু আবেদনপত্রের উপরে লিখে দেন, "প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনও তথ্য জানাতে পারব না।" এর পরেই তাঁরা তথ্য কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন সন্তোষবাবুকে শো-কজ করে। অবিলম্বে ডাকযোগে আবেদনকারীদের সমস্ত তথ্য পাঠানোর নির্দেশও দেয়।

কিন্তু এর পরেও সন্তোষবাবুর কাছ থেকে কোনও চিঠি আসেনি। গত জুনে সুনীলবাবু ফের তথ্য কমিশনে বিষয়টি জানান। জুলাইয়ের শেষে কমিশন দু'পক্ষকে শুনানিতে ডাকে। আড়শার বিডিও অনির্বাণ সোম সেখানে হাজির ছিলেন। সন্তোষবাবু সাফাই দেন, "গত ৩ জানুয়ারি তদানীন্তন পঞ্চায়েত প্রধান বিজলাদেবী আমাকে লিখিত নির্দেশ দেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া কাউকে কোনও তথ্য দেওয়া যাবে না। তাই চুপ ছিলাম।" কমিশনের কর্তারা পাল্টা প্রশ্ন করেন, সে ক্ষেত্রে গত বছর সেপ্টেম্বরে করা আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য দেওয়া হয়নি কেন? এর পিছনে 'অসদুদ্দেশ্য' ছিল সাব্যস্ত করে কমিশন পঞ্চায়েত সচিবকে জরিমানা করে। চার কিস্তিতে তাঁকে ওই টাকা দিতে হবে। না-পারলে তাঁর বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। সন্তোষবাবুর আক্ষেপ, "প্রধান বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমিই ফেঁসে গেলাম।" শালইডহর গ্রামের বাড়িতে গিয়েও বিজলাদেবীকে পাওয়া যায়নি। বিডিও বলেন, "কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"

(আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ আগস্ট ২০০৮)

EXIM INDIA TRADE AGENCIES

36, Strand Road, Kolkata 700001
Phone : 22484056, 22105324
Mobile : 9831020442

Import & Export Consultants,
Clearing, Forwarding and Commission
Agents, Liason Work of Import
and Export

রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জমি ফিরে পেলেন

সন্তোষ শর্মা

কলকাতা হাইকোর্টের একটি রায়ে রাজ্য সরকার-কে বেআইনি ভাবে অধিগৃহীত জমি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ৮ আগস্ট ১৯৯৬ সালে রাজ্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ঢাকুরিয়ার দক্ষিণাপন-এর বাসিন্দা মহামায়া রায়চৌধুরির ১১ কাঠা জমি 'জনস্বার্থে অধিগ্রহণ' বলে নিয়ে কোনও বাণিজ্যিক উদ্যোগের কাজের জন্য দিয়ে দিয়েছিল। ১৯৯৭ সালে মহামায়া কোর্টের কাছে আবেদন করেন যে তার জমি বেআইনিভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ২৫ নভেম্বর ১৯৯৮ সালে বিচারপতি এস.বি. সিনহা তার রায়ে জমি অধিগ্রহণের উপর স্থগিতাদেশ জারি করেন এবং রাজ্য সরকারকে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এরপর রাজ্য সরকার ডিভিশন বেঞ্চ-এ আবেদন করে। এরপর ৯ জানুয়ারি ২০০৮ এ বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত রাজ্য সরকারকে আবার নির্দেশ দেন যে বেআইনি ভাবে অধিগৃহীত জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। সরকারকে ৫১০০ টাকা জরিমানা দেওয়ার জন্য বলা হয়।

আজ ডিভিশন বেঞ্চে এর দুই বিচারপতি প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বিচারপতি তপনকুমার মুখার্জি রাজ্যের আবেদনকে খারিজ করে রাজ্য সরকার-কে নির্দেশ দেন যে মহামায়া রায়চৌধুরির অধিগৃহীত জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

(তত্রসূত্র : দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া : ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

৪০ বছর পর জমির মূল্য দেওয়ার নির্দেশ

৪০ বছর ধরে চলা একটি মামলা চলার পর রাজারহাটের এক চাষি পরিবারের জমির মূল্য বাবদ টাকা ও ওই পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরি দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার-কে সুপ্রিম কোর্টের 'ডিভিশন বেঞ্চ' নির্দেশ দিয়েছে। আবেদনকারী কৃষ্ণপদ প্রামাণিক-এর ছেলে রামেশ্বর প্রামাণিকের উকিল রসময় মণ্ডল বললেন, ১৬ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে রাজ্য সরকার বিনা-আইনে ওই কৃষক পরিবারের জমি অধিগ্রহণ করেছিল এবং জমির মূল্য এক টাকাও দেয়নি। হাইকোর্টের পর মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। উকিল রসময় মণ্ডলের মতে ৪০ বছর পর জমির মূল্য প্রায় ২০ কোটি হয়ে গেছে। তিনি এ-ও প্রশ্ন তোলেন রাজ্য সরকার ও রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের গাফিলতির জন্যই এত পরিমাণ টাকা দিতে হচ্ছে।

(তথ্যসূত্র : দৈনিক বিশ্বমিত্র : ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৮)

আনন্দবাজার পত্রিকা

শুক্রবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮

বাড়িতে ‘ভূত পোষা’র শাস্তি

ছ’মাস ধরে পরিবারকে বয়কট শালবনিতে

মার্কসবাদের সাহায্যেই বঞ্চিত মানুষরা কিছুটা হলেও তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছে

‘সংবাদ’-এ প্রকাশিত রোদ্দুর বিশ্বাসের ‘সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোটরঙ্গ একটি নিকৃষ্ট ফল, পবিত্র শাসনকার্যে চাই অপার্থিব উদার চেতনা’ শীর্ষক উত্তর সম্পাদকীয়ের প্রেক্ষিতে আমার এই চিঠি। রোদ্দুরবাবু গণতন্ত্রের প্রহসনটা তুলে ধরতে রাজনৈতিক দলগুলোর তথা ভোটারদের দুর্নীতি ও অযোগ্যতাকেই দায়ী করেছেন। এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু পরবর্তী আলোচনা ভুল তথ্যে ও ভুল ধারণায় পরিপূর্ণ। সঠিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশচালনাকারী শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকাটা তিনি জরুরি মনে করেছেন। এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, রোদ্দুরবাবু একজন সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি নতুবা তিনি নিজে ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলেও সুপরিকল্পিতভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ নিয়ে লিখেছেন। রোদ্দুরবাবু কি জানেন না, ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষই ঈশ্বরবিশ্বাসী? তিনি কি জানেন না রাষ্ট্রনেতারা ঈশ্বরবিশ্বাসী? ‘ঈশ্বর পাপ দেবেন’ চিন্তা মানুষকে যদি দুর্নীতি থেকে বিরত করতেই পারত তবে ভারতের মতো ঈশ্বরবিশ্বাসীদের দেশ কখনই দুর্নীতিতে বিশ্বের প্রথম সারিতে স্থান করে নিতে পারত না। বরং এই ঈশ্বরবিশ্বাস নির্ভর ধর্মেই রয়েছে সমস্ত অকাজ-কুকাজ করেও পার পাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা। বিশ্বের সব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুয়ে গিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের নিশ্চিত গ্যারান্টি।

অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত করতে ‘ঈশ্বর’ নামের জুজুর ভয়ের কোনো প্রয়োজন হয় না। যে মানুষ নিজেকে সার্বিক আদর্শবোধ ও সার্বিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত করে সে কখনই খারাপ কাজ করে না। তাকে দিয়ে কোনো অন্যায় কাজ করানো যায় না। আইনস্টাইন থেকে গৌতম বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর থেকে কার্লমার্কস, লেনিন-এঁরা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়েও কোনো অন্যায় কাজ করেননি। কাজেই জড়বাদী বা যুক্তিবাদী বা মানবতাবাদীরা কখনই মানবপ্রেমিক হতে পারে না—এ ধারণা একেবারেই ভুল। আর জড়বাদী বা যুক্তিবাদীরা সংখ্যায় কমছে ও ধারণাও ঠিক নয়। কারণ রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী সংখ্যাধিক্যের বিচারে পৃথিবীতে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে নিরীশ্বরবাদী মানবধর্ম।

আধ্যাত্মবাদকে শাশ্বত বা চিরন্তন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন লেখক।

এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। ঈশ্বরজাতীয় কল্পনা এসেছে মাত্র দু-তিন হাজার বছর আগে। তার আগে মনুষ্য প্রজাতি পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে নিজের ওপর ভরসা করে। মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চালিয়ে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে। অনেক পরে অসহায় মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে ভয় করেছে, শ্রদ্ধা করেছে। সেসময় ঈশ্বরবিশ্বাস নির্ভর হিন্দু মুসলিম, খ্রিস্টান ধর্ম-সহ অন্য সব ধর্ম গড়েই ওঠেনি। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ বেদে কিংবা প্রাচীন দর্শন 'কর্ম মীমাংসা'-তে কোথাও ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা বলা হয়নি। প্রাচীন চার্বাক দর্শনও ঈশ্বর বিশ্বাসের আগে তৈরি হয়েছিল। লেখক মার্কসবাদকে দর্শন হিসেবে দেখেছেন। এটাও ভুল। কারণ নিজে কার্লমার্কস তাঁর মতবাদকে দর্শন হিসেবে দেখেননি। তিনি সমাজের মধ্যে কীভাবে অর্থনৈতিক সাম্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় তা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলেছেন। তাঁর এই মতবাদ দর্শন নয়, আসলে সমাজবিজ্ঞান। তিনি এ-ও বলেছেন, তাঁর এই মতবাদ সর্বকালের ও সর্বস্থানের জন্য সবটাই সত্য নাও হতে পারে। এরও পরিবর্তন ও সংশোধন প্রয়োজন। তাই পরবর্তী উত্তরসূরি লেনিন, মাও-রা এর সংশোধন করেছেন। কাজেই কোনো মতবাদই শাশ্বত বা চিরকালের জন্য নয়। এটা যে-কোনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন জীব বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের মতবাদেরও আজ অনেক কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

তবে তথাকথিত তকমাধারী ভারতীয় মার্কসবাদীরা যে মোটেই মার্কসবাদকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি এ ব্যাপারে লেখকের সঙ্গে আমি একমত। কারণ এদের কাছে মার্কসবাদ হল ক্ষমতায় থাকার মুখোশ। এরা নিজেদের আদর্শবোধ ও মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কাজেই মার্কসবাদীরা অমানবিক হলেও মার্কসবাদ কখনই তা নয়। কারণ মার্কসবাদের সাহায্যেই দুনিয়ার বঞ্চিত মানুষরা পৃথিবীতে কিছুটা হলেও তাদের সম্মান ও অধিকার ফিরে পেয়েছে।

—মধুসূদন মাহাতো, কাটাবেড়া, গড়ফুসড়া, পুরুলিয়া

উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বয়স ২৪+

যুক্তিবাদী, স্নাতক, স্বনির্ভর, সুশ্রী জীবনসঙ্গিনী চাই

ফোন : ০৯২৩২৪৬৭৩৩৫

কর্মস্থল : রায়গঞ্জ, উ. দিনাজপুর

আমি সিঙ্গুরের কৃষক, এই সরকার আমার প্রশ্নের জবাব দিক

আমি সিঙ্গুর এলাকার টাটা প্রকল্পের পাশের গরাম সিংহের ভেড়ির জমিহারা একজন কৃষক। টাটা প্রকল্পের জন্যই জমি হারাতে হয়েছে আমাকে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী বলছেন, সিঙ্গুরে বেকার সমস্যা বহুলাংশে মিটে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির চেহারাটাই পালটে যাবে।

টাটা প্রকল্প সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন আমার মাথায় বেশ কিছু দিন ধরে ঘুরছে, যার আদি-অন্ত আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছি না।

১) ১৯০৫ সালে জামশেদজি টাটা বিহারে (বর্তমানে যা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত) এ দেশ তথা এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলেন কয়েকশো আদিবাসী ও তাদের গ্রাম উচ্ছেদ করে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ভারতের ২৬টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আর্থিক দুরবস্থায় ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্থান ২৬তম স্থানে কেন, টাটার কারখানা স্থাপনের ১০৩ বছর পরেও?

২) প্রতিদিন যে পাঁচ হাজারের মতো বি পি এল শ্রেণী তফসিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষিশ্রমিক ভোরের ট্রেনে জৌগ্রাম, ধনেখালি, তারকেশ্বর, হরিপাল, বাহিরখণ্ড প্রভৃতি স্টেশনের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এসে টাটার কারখানার জন্য অধিগৃহীত জমিতে এতকাল কাজ করত, তাদের জন্য কি কোনও পুনর্বাসন প্রকল্প হবে?

৩) এছাড়া যে কয়েকশো কৃষিশ্রমিক চাষের মরশুমে ২৪ পরগনার গোসাবা, নামখানা, কাকদ্বীপ, বাঁকুড়ার সারেঙ্গা, রায়পুর, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল থেকে এসে পাড়ায় পাড়ায় বিনাপয়সায় দল বেঁধে থেকে, আলু তোলার সময় ৫০-৬০টি ঘোড়ার গাড়ি করে দূরবর্তী রাস্তাবিহীন মাঠের আলু সোজা হিমঘরে মজুত করে, এক মাসের মধ্যে কয়েক হাজার টাকা উপার্জন করে বাড়ি ফিরে যেতেন তাঁদের কী হবে?

৪) বর্ষায় শ্রাবণ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত কৃষিকাজের মন্দার সময় টাটা প্রকল্পের পাশের গ্রাম খাসের ভেড়ি ও আশপাশের গ্রামগুলির কয়েকশো তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন বিভিন্ন নয়ানজুলি ও জুলকিয়া নদীতে মাছ ধরে যে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের কী হবে? এইসব নয়ানজুলি ও জুলকিয়া নদীতে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে আমাদের মতো কৃষিজীবী লোকজনের বোয়াল ও গলদা চিংড়ি ধরে

খাওয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম।

এছাড়া, হাজার একর কৃষিজমির যাঁরা আসল মালিক, পাঁচ হাজার স্থায়ী কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির ভিতরে তাঁদের জায়গা হবে কিনা, সে প্রশ্ন তো আছেই।

কোনও এক সি পি এম নেতা টিভিতে বলছেন দেখলাম, যখন ১৯৫৫-৫৬ সালে দুর্গাপুরে স্টিল প্ল্যান্ট হয়, তখন তো আমরা বাধা দিইনি। আমি দেখেছি, দুর্গাপুরে স্টিল প্ল্যান্ট হয়েছিল শালের জঙ্গল কেটে কাঁকুরে মাটিতে। আর সেই সময় থেকে আমাদের সিংহের ভেড়ি ও পার্শ্ববর্তী মাঠের মাটি কত যে উর্বর তা একটি ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবেন। সেটা ১৯৫৩ সাল। আর্থিক কারণে সে বছর আমার বাবা ও কাকারা আলুচাষ না করে ফুলকপির চাষ করবেন, ঠিক করলেন। এবং, জানতে পারলেন যে, শেওড়াফুলির এক বীজ ব্যবসায়ী হল্যান্ড থেকে সে বছর উন্নত জাতের ফুলকপির বীজ 'স্নো বল' এনেছেন। যদিও তা দামে একটু বেশি। সেবার ফলনের পর ফুলকপির সাইজ দেখে এলাকার চাষিরাই তাজ্জব হয়ে যান। এক-একটির সাইজ ছিল ছোট চ্যাঙারির মতো আর রং দুধের মতো সাদা! সেই কপির বেশিরভাগটাই শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে বিক্রি করা হয়েছিল। এবার আমার বাবার মুখের কথা শুনুন : "সেদিন দু' বাজরা কপি নিয়ে গিয়েছি। এক বাজরা কপি বৈঠকখানা বাজারের আমার পরিচিত এক খুচরো ব্যবসায়ী নিয়ে পরে দাম আনতে বলল। আমি দ্বিতীয় বাজরা বিক্রি করে দাম আনতে গিয়ে তার পাশে বসে আছি। হঠাৎ স্যুট-প্যান্ট-টাই পরিহিত এক ভদ্রলোক সেই দোকানে এসে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এত বড় এবং এত সাদা যে ফুলকপি হয়, তা আমার ধারণা ছিল না। সেই ভদ্রলোক আমার পাইকারি দামের তিন গুণ দাম দিয়ে একটি কপি কিনে জিজ্ঞাসা করলেন, এই কপি কোথায় চাষ হয়, চাষিই বা কারা? খুচরো ব্যবসায়ী তখন পাশে বসা আমাকে দেখিয়ে দিল। ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে আমার আপাদমস্তক ভালো করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বিড়ি খাই কি না। আমি 'হ্যাঁ' বলায় তখনই তিনি পকেট থেকে 'ক্যাপস্টান' সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমায় দিয়ে দিলেন এবং বললেন, স্বাধীন ভারতের প্রকৃত উন্নতির জন্য আপনাদের মতো চাষিদের একান্ত প্রয়োজন। আপনারাই জাতির ভবিষ্যৎ!"

পরের ঘটনা খুবই পরিচিত। কামারকুণ্ডু স্টেশন সংলগ্ন মাঠে ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সন নাগাদ দু'বার কৃষিমেলা হয়। এবং দুইবারই আমার বাবা ফুলকপি ও আখ চাষে প্রথম হয়ে পুরস্কার লাভ করেন।

আমার বাবারা ছিলেন চার ভাই। চার ভাই পরিশ্রম করে, কেবলমাত্র চাষের সাহায্যে পিতৃদত্ত সাত বিঘা জমি থেকে পঁয়ত্রিশ বিঘায় নিয়ে যান। সরকার যখন দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে করে তখন তাতে আমাদের ১৫ বিঘা জমি চলে যায়। বাকি

২০ বিঘার মধ্যে ১৬ বিঘা টাটা প্রকল্পের মধ্যে চলে যাওয়ায় চার ভাইয়ের উত্তরাধিকার হিসাবে আছে মাত্র চার বিঘা জমি। অর্থাৎ, আমরা এখন দরিদ্রতম কৃষক।

রাজ্যের মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর মাসিক আয় প্রকল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলি, যে হারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খাদ্যশস্যের অভাব ঘটছে এবং দাম বাড়ার ফলে খাদ্যের জন্য দাঙ্গা হচ্ছে, যেমন—বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে, এবং আমাদের দেশে যে হারে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে তাতে টাটাদের কল্যাণে আমাদের জীবনে অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ উঁকি দিচ্ছে।

আমাদের অতি পরিচিত সিঙ্গুর এলাকার এক সি পি এম নেতা সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন যে, জমিহারা কৃষকের বাড়ির পুরুষেরা টাটার অফিসারদের বাসগৃহে মালি বা দারোয়ানের কাজ পাবে এবং মহিলারা পাবে ঝিয়ের কাজ। একমাত্র কোনও অতি নিম্নরুচির, মনুষ্যত্ববিহীন, পৈশাচিক ব্যক্তি এমন জঘন্য কথা বলতে পারে। আমার বাবার বয়স এখন ৯২ বছর। মাঠে কাজ করতে পারেন না, তবে এখনও মাঠের ধারে যান আর বোধহয় ভাবেন : স্বাধীনতার পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে, ডুবির ভেড়ি এবং কাকদ্বীপের মতো কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, পুলিশকে এড়াতে রাতের পর রাত জমিদারি বাঁধের বেনাবনে সাপের কামড়ের ভয় উপেক্ষা করে, জোঁক আর মশার কামড় খেয়ে পড়ে থেকেছিলাম কি একদিন মর্যাদাসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল কৃষক থেকে ভূমিহারা কৃষকে পরিণত হওয়ার জন্য? টাটা প্রকল্পের বাবুদের বাড়িতে স্বাধীনতাহীন দাসদাসী হিসাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খাটানোর জন্য? নাকি, ৪০-৫০ হাজার নিরক্ষর অল্পশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের পেটের ভাত চিরতরে কেড়ে নিয়ে পাঁচ হাজার শিক্ষিত ও অতি-শিক্ষিত লোকের উচ্চাভিলাষী জীবনযাপন দেখার জন্য?

—বৃন্দাবন মণ্ডল, গ্রাম + পো: সিংহের ভেড়ি, হুগলি

(সৌজন্যে : বর্তমান)

নেপালের ভোর

✶ ২৮ মে : 'সাধারণতন্ত্রের ভোর' হতে দেরি নেপালে।

আজকের ডায়েরি বলছে, নেপালে 'সাধারণতন্ত্রের ভোর' প্রায় ১২ ঘন্টা পিছিয়ে দিলেন নেতারাই। সাধারণতন্ত্রকে স্বাগত জানাতে কিন্তু সকাল থেকেই রাজধানীর রাস্তা ভরে ফেলেছিলেন সাধারণ মানুষ। নারায়ণহিতি প্রাসাদের সামনে দিয়ে মাওবাদীরা এসেছেন। লাল পতাকা উড়িয়ে, অন্যরা এসেছেন রঙিন বেলুনের ঝাঁক। তরুণ-তরুণীরা মুখে রং দিয়ে লিখেছেন, জয় হোক সাধারণতন্ত্রের।

✶ ২৭ জুন : কোইরালা ইস্তফা দিলেন।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী গিরিজাপ্রসাদ কোইরালা নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। এই ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাওবাদীদের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের রাস্তা পরিস্কার হয়ে গেল।

সু পা র ম্যা ন

রণে বনে জঙ্গলে ...

সৌম্য দেব / আসানসোল

আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং
হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

দীপাবলি সংখ্যা নভেম্বর ২০০৮ দাম : ১৫ টাকা

কাশ্মীরের আজাদি
কল্যাণ ও উন্নয়ন
নার্কো টেস্ট কী?
ন্যানোর হিসাব
উপভোক্তা বিষয়ক আইন
ভূত পোষার শাস্তি
নতুন প্রজাতন্ত্র নেপাল

যুক্তিবাদী লেখা পাঠান

- ধর্ম থেকে রাজনীতি, সিনেমা, নাটক, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান—যে কোনও সমকালীন ও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে লেখা হতে পারে।
- পৃষ্ঠার একদিকে মার্জিন রেখে, প্রতি লাইনের পরে যথেষ্ট ফাঁক রেখে ফুলস্কেপ কাগজে লিখবেন।
- যথাসম্ভব পরিষ্কার হাতের লেখায়, সঠিক বানানে লিখবেন।
- অবশ্যই মূল লেখাটি পাঠাবেন, নিজের কাছে কপি রাখবেন। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।
- তথ্যসূত্র দিলে শুধু পত্রিকার নাম দেবেন না, তার সঙ্গে তারিখ দেবেন।
- লেখার শেষে নাম-সই সহ ঠিকানা লিখতে হবে।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ

প্রবীর ঘোষ-এর

মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা ১০০

মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী স্মৃতিধর এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার শুনেই নাকি মুখস্থ করে ফেলেন ৭০-৮০ হাজার শব্দের ডিকশনারী। সত্যিই কি তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী? নাকি কৌশলে বোকা বানাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে? আমাদের পরীক্ষায় ১৫-২০টি শব্দও মনে রাখতে পারছিলেন না? জানতে চান? রুদ্ধশ্বাস কাহিনি।

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং... ১২৫

'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস'-এ এনেছেন 'সন্ত্রাস'-এর নানা সংজ্ঞা। কী বলছে উইকিপিডিয়া, রাষ্ট্রসংঘ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ? 'নেপাল' প্রবন্ধে এসেছে মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, তাদের গেরিলাযুদ্ধের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগের খুঁটিনাটি। বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের নানা জ্বলন্ত সমস্যা।

প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

"অন্ধতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে, অলীক বিশ্বাসের নামে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সে একা একটি সৈন্যদল।...এই কাজে প্রবীরের প্রাথমিক প্রেরণা এবং মূল্যবান নেতৃত্ব ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।"
— ডঃ পবিত্র সরকার।

অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম) ১৬০ (২য়) ১২৫ (৩য়) ২০০ (৪র্থ) ১২৫ (৫ম) ১০০

মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ-মেডিটেশন ১২৫

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : 2219-7920
Fax : 2219-2041 e-mail : deyspublishing@hotmail.com

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন। সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল
ঠিকানা : ৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৫৯-০৪৩৫
• e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com •
website : www.prabirghosh.tk, www.thefreethinker.tk,
www.juktibadi.tk
কলকাতা অফিস : ৩৩এ ক্রিক রো, মৌলালী, কলকাতা-১৪ থেকে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত